বেসিক অব ইসলাম

BASIC OF ISLAM

Myths vs Facts

১ম খণ্ড

(রাসূলরা বলল) পরিস্কারভাবে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া ছাড়া আমাদের কোন দায়িত্ব নেই।

[আল কুরআন,ইয়াসিন ৩৬:১৭]

Quran Lexicon Institute

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

সূচিপত্র

১ম অধ্যায়........3
ভূমিকা........3
পটভূমি........4
রেফারেন্স........9
২য় অধ্যায়-মৌলিক পরিভাষা........10
ইবাদত........10
কালেমার প্রতিটি শব্দের অর্থ........15
লা........15
ইলাহ........15
ইল্লা........19
আল্লাহ........19
"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অর্থ........19
রব........24
তাগুত........31
ইমান ও মুমিন........35
শরীয়াহ........40
দ্বীন........47
ইসলাম ও মুসলিম........49
কুফর ও কাফের........53
শিরক ও মুশরিক........55
নিফাক ও মুনাফিক........57
জাহিলিয়্যাহ........62
ফাসিক........65
হুকুমিয়াহ........65
মোত্তাকি........67
দলালা (সঠিক পথের বিপরীত পথ)........68
শয়তান........69
কিতাব........73
তাকদীর........80

আকীদা 89
কেন মুসলিমরা আজ ভাবাদর্শিকভাবে ডিবাইডেড 92
সংক্ষেপে সকল শব্দের সংজ্ঞায়ন.. 93

১ম অধ্যায়

ভূমিকা

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর প্রতিটি শব্দ, আমরা অনেকে সচারচর যে অর্থে বুঝি, তা যদি আমরা রাসুল সঃ এর সমসাময়িক অভিধানের সাথে মিলিয়ে দেখি, তাহলে দেখতে পাই, এদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে । সকল নবীরা শুধুমাত্র লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর দাওয়াত দিলেও, আজকে আমরা শুধুমাত্র লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর দাওয়াতকে পরিপুর্ন মনে করতেছি না, শুধুমাত্র কালেমার ভাবার্থ না বুঝার জন্য এবং প্রতিটি শব্দের বিস্তারিত ধারনা না বুঝার জন্যে।

তাই, আজকাল কেউ 'মডারেট ইসলাম', কেউ 'মৌলবাদী ইসলাম' বলছে—ইসলামকে নানা নামে বিভক্ত করার চেষ্টা করতেছে। অথচ, ইসলাম তো একটাই, এখানে কোনো বিভ্রান্তি বা "গ্রে এরিয়া" নেই।

যদি আমরা কালেমার আসল অর্থ বুঝতে না পারি, তাহলে বিভ্রান্তির শিকার হব। কালেমার গভীর অর্থ হৃদয়ে গ্রহণ করতে না পারলে, আজকের সময়ের জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে আদর্শিক লড়াই করা সম্ভব নয়। মুক্তির জন্য ভাবাদর্শের লড়াই অপরিহার্য, কিন্তু সমস্যা হলো একটাই, আমরা অনেকেই কালেমার প্রকৃত ভাব উপলব্ধি করতে পারছি না। এজন্য মুসলিমদের মাঝে মতের মিল নেই, সবাই ভিন্ন ভিন্নভাবে চিন্তা করছে। আল্লাহ আমাদের কালেমার ভাবাদর্শের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দিন।

আমাদের চেষ্টা ছিল, আমাদের ব্যক্তিগত মতামত কম রেখে, সঠিক এবং সহজবোধ্যভাবে আলোচনা করা। আমরা এমনভাবে কুরআনের অর্থ বোঝার চেষ্টা করেছি, যেভাবে রাসূল (সা.)-এর যুগে মানুষ তা বুঝতো। এজন্য আমরা ক্লাসিকাল অভিধানের সাহায্য নিয়েছি, যেখানে প্রাচীন বিদ্বানরা আল্লাহর নাজিলকৃত শব্দের মূল ভাব ধরে রাখার জন্য কাজ করেছেন। কুরআনের বেসিক এই শব্দ গুলো কেও না বুঝলে কুরআনে ৪/৫ অংশই মানুষ বুঝবে না। অনেক ইউনিভার্সিটি ছাত্ররা বলে, কুরআনের অনুবাদ পড়েও কুরআন বুঝতেছে না, তাদের জন্য ইনশাল্লাহ এই বইটা উপকারী হবে।

মানুষের যেকোনো কাজে ভুল হতে পারে, আর আমাদের মতো সাধারণ মানুষের ভুল বেশি হওয়াটা স্বাভাবিক। তাই, যদি এই বইয়ের কোনো ভাষাগত বা তথ্যগত ভুল পান, অনুগ্রহ করে আমাদের জানাবেন। আমরা ভুল শুধরে নিতে আগ্রহী।ভুল করা মানবীয়, কিন্তু ভুলে থেকে যাওয়া অন্যায়। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি আমাদের সেই অন্যায় থেকে রক্ষা করেন।

আমিন।

পটভূমি

জন্মগতভাবে মানুষ মুসলমান হয় না, যেমনিভাবে নূহ (আঃ)-এর পুত্র মুসলমান ছিল না। মুসলমান হতে হলে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কালেমার অর্থ বুঝে এবং তা স্বীকার করে ঈমান আনতে হয়। শুধুমাত্র মুখে কালেমা বলা যথেষ্ট নয়, সেই কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করার পাশাপাশি বাস্তবে তা মেনে চলার মাধ্যমে মুসলমান হতে হয়। অর্থাৎ, যে কালেমা বা কথার উপর ঈমান এনেছেন, সেটিকে জীবনযাপনে বাস্তবায়ন করতে হবে।

আল্লাহ কোরআনে স্পষ্টভাবে আমাদের শিক্ষা দেন যে, শুধু জন্মের কারণে কেউ মুসলমান হতে পারে না। যেমন নূহ (আঃ)-এর পুত্র মুসলমান ছিল না। আল্লাহ বলেন:

قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ

"হে নূহ, সে (তোমার ছেলে) নিশ্চয় তোমার পরিবারভুক্ত নয়, কারণ সে অসৎ কর্মপরায়ণ।" (সূরা হুদ, ১১:৪৬)

আবার, আল্লাহ নূহ (আঃ)-এর স্ত্রী ও লূতের (আঃ)-এর স্ত্রীর উদাহরণ দিয়ে বলেন:

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ۗ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ

"যারা কুফরি করেছে, তাদের জন্য আল্লাহ নূহের স্ত্রী এবং লূতের স্ত্রীর উদাহরণ দিয়েছেন। তারা দু'জন সৎ বান্দার অধীনে ছিল, কিন্তু তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তাদের স্বামীরা আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদের বাঁচাতে পারেনি। তাদের বলা হলো, 'তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করো।'" (সূরা আত-তাহরীম, ৬৬:১০)

এই আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, নূহ (আঃ)-এর স্ত্রী ও লূতের স্ত্রী মুসলমান ছিলেন না, যদিও তারা নবীর পরিবারের অংশ ছিলেন। জন্মের ভিত্তিতে মুসলিম হওয়া যায় না; ঈমান ও জীবনযাপনে কালেমার দাবী বাস্তবায়ন মাধ্যমে প্রকৃত মুসলমান হতে হয়।

আবার, অমুসলিম পরিবারে থাকলেই যে মুসলিম হওয়া যাবে না, তা সঠিক নয়। কোরআনে আমরা ফেরাউনের স্ত্রীর উদাহরণ পাই, যিনি অমুসলিম পরিবেশে থেকেও ঈমানদার ছিলেন। আল্লাহ বলেন:

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

"আর মুমিনদের জন্য আল্লাহ ফেরাউনের স্ত্রীর উদাহরণ দিচ্ছেন। সে বলেছিল, 'হে আমার প্রভু! আমার জন্য তোমার কাছে জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করো এবং আমাকে ফেরাউন ও তার অপকর্ম থেকে বাঁচাও। আর আমাকে জালেমদের (হাত) থেকে উদ্ধার কর।'" (সূরা আত-তাহরীম, ৬৬:১১)

এই আয়াত গুলো থেকে স্পষ্ট, ইমান কারো পৈতৃক সম্পওি না। ইমান গ্রহন করতে হয় সুস্পষ্ট ভাবে জেনে বুঝে।

আল্লাহ আরও বলেন:

مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

"যারা জেনে-শুনে সত্য সাক্ষ্য দেয়।" (সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩:৮৬)

قُلْ هَـٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

বল, 'এটা আমার পথ। আমি জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই'।

Yusuf 12:108

এই আয়াতগুলো আমাদের শেখায়, ঈমান গ্রহণ করতে হয় জ্ঞান ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে।

ধর্মের বিষয়ে বাঙালির আবেগ ও ভালোবাসার কোনো ঘাটতি নেই, তবে ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান অনেকের কাছেই অপ্রতুল। এমনকি অনেক ধর্মভীরু বাঙালিকেও যদি কালেমার অর্থ জিজ্ঞাসা করা হয়, তারা সঠিকভাবে তা ব্যাখ্যা করতে পারেন না। এটি আমাদের সমাজে একটি বড় ঘাটতি, বিশেষ করে যারা দাওয়াতি কাজ করেন। তাদের দাওয়াতও অনেক সময় অস্পষ্ট এবং বিভিন্ন ভুল তথ্যের সমন্বয়ে ভরা থাকে। অথচ সকল নবী ও রাসূলের প্রধান দায়িত্ব ছিল, সুস্পষ্টভাবে এবং ভুল ছাড়া সঠিক বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

আল্লাহ বলেন:

وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

"আর শুধুমাত্র সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেওয়াই আমাদের দায়িত্ব।" (সূরা ইয়াসিন, ৩৬:১৭)

এটি আমাদের জন্য একটি শিক্ষা যে, দাওয়াতের কাজ করতে হলে তা স্পষ্ট, বিশুদ্ধ এবং সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

বাংলাদেশের বাহিরে ইসলামিক কেন্দ্র গুলোতে অনেক অমুসলিম খুবই আগ্রহ নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে আসেন। প্রথমেই তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, তারা কেন ইসলাম গ্রহণ করতে চান? ইসলাম সম্পর্কে তারা কী জানে? এরপর তাদেরকে ইসলামী ঈমান বা ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অর্থ কী? খ্রিস্টানদের এক আল্লাহয় বিশ্বাস, পৌত্তলিকদের এক আল্লাহ বিশ্বাস এবং মুসলিমদের এক আল্লাহয় বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য কী? ঈমান কী? কীসের কারণে ঈমান বাতিল হয়? শিরক বলতে কী বোঝায়? কুফর কী? ইসলামের মূল বৈশিষ্ট্য কী? ইত্যাদি।

ইসলামী বিশ্বাসের মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান ও উপলব্ধি না থাকলে ইসলামকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। ইসলামের মূলনীতি এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সঠিক ধারণা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে।

ইসলাম গ্রহণকারী অমুসলিমদের মধ্যে অনেকেই ইসলামের মৌলিক প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে পারেন। কারণ তারা সাধারণত ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত পড়াশোনা করে আসেন। যেসব নতুন আগ্রহী ব্যক্তিরা এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন না, তাদেরকে আগে এসব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, তারপর তাদেরকে কালিমা পড়ানো হয়।

এসব বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকলে, কালিমা পড়া অর্থহীন হয়ে পড়ে। এমনও হতে পারে, কালিমা পাঠের পরেও তাদের মধ্যে এমন কিছু বিশ্বাস থেকে যায় যা কালিমার পরিপন্থী। অথবা কালিমা পড়ার পর তারা এমন কিছু কাজ করবেন, যা তাদের ঈমান নষ্ট করে দেবে।

কিন্তু, নতুন মুসলিমদের জন্য এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করলেও বাংলাদেশের অনেক ধার্মিক মুসলমানও এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর জানেন না। এর ফলে, তারা এমন অনেক ধারণা, বিশ্বাস, বা কর্মে লিপ্ত হন, যা তাদের ঈমানকে দুর্বল বা নষ্ট করে দিতে পারে।

"কেন এমন হচ্ছে? যেখানে ঈমানই মূল, সেখানে ঈমান সম্পর্কে না জেনে বা ভাসা ভাসা ধারণা নিয়ে কিভাবে আমরা প্রকৃত মুসলমান হতে পারি?" যে কোনো বিবেকবান পাঠক বুঝতে পারবেন যে, আমাদের এই অবস্থার পরিবর্তন করা উচিত। আমাদের উচিত দীনের মূল শিক্ষা সঠিকভাবে জানা এবং কীভাবে ঈমান দৃঢ় করা যায় এবং কীসে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তা বোঝা।

উম্মতের মধ্যে ইসলামিক বিষয় সমূহের ক্ষেত্রে অনেক বিতর্ক ও মতভেদ রয়েছে। এই কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যে ব্যক্তি তৎকালীন অভিধান থেকে এরাবিক শব্দ গুলোর অর্থ বুঝে কুরআন কারীম ও সহীহ হাদিস গুলি মনোযোগের সাথে পাঠ করবেন এবং প্রথম তিন শতাব্দীর আলেমদের লেখা বইপত্র, বিশেষত প্রসিদ্ধ চার ইমামের লেখা বই এবং পড়ে সামগ্রিক ইসলামিক বিষয় সমূহ শিখবেন, তারা নলেজ এবং যে ব্যক্তি পরবর্তী যুগের বিশেষত ক্রুসেড ও তাতার আক্রমণে মুসলিম বিশ্ব ছিহ্নভিন্ন হওয়ার পরে-হিজরি সপ্তম শতকের পরের-আলেমদের লেখালেখি পড়ে ইসলাম শিখবেন, তার সামগ্রিক ইসলামিক বিষয় সমূহের নলেজের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যাবে। আবার এক্ষেত্রে সপ্তম শতকের সাথে ১৩শ শতকের মধ্যে অনেক পার্থক্য,বিবর্তন ও পরিবর্তন লক্ষণীয়। সকলেই কোরআন ও হাদিসের "দলিল" প্রদান করেন। তবে প্রথম ব্যক্তি কোরআন, হাদিস ও প্রথম যুগের আলিমদের কথাকেই মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এগুলির অতিরিক্ত কথা বা মতামত অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি মূলত পরবর্তী যুগের আলেমদের মতামতকেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তার ভিত্তিতে কোরআন ও হাদিসের কথা গ্রহণ,বর্জন বা ব্যাখ্যা করেন।

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহিমাহুল্লাহ) এই ব্যাপারে বলেন- পুরাতন ও নতুনের এই মতভেদে পুরাতনের প্রতি আমাদের আকর্ষণ ও দুর্বলতার কখনোই গোপন করি না।

কখনো চিন্তা করেছেন কি- প্রথম চার শত বছর, কোরআনের কোন তাফসীর গ্রন্থ লেখা হয় নাই কেন? সকল বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ চারশত বছর পরের কেন?

আল্লাহ যেখানে বারবার বলেছেন যে, তিনি কোরআনকে সহজভাবে এবং বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, সেখানে আল্লাহ থেকে সজভাবে এবং স্পষ্ট করে বর্ননা করার ক্ষমতা আর কার আছে?

প্রথম চারশত বছর তাফসীরের পরিবর্তে পাবেন-এরাবিক অভিধান। যেখানে তৎকালীন আরবরা কুরআনের প্রতিটা শব্দ যে অর্থে বুঝতো এবং প্রতিটা শব্দ যে ধারনা তৈরি করতো তা নিয়ে গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক লেখা পাওয়া যায়।

আলী রাঃ এর শাসন আমলে যখন ইসলাম সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে, তখন অনারবরা যাতে কুরআন সহজে বুঝতে পারে সে জন্য আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) এর পরামর্শে আবু আল-আসওয়াদ আদ-দু'আলি ব্যাকরণের নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন। তাই, আবু আল-আসওয়াদ আদ-দু'আলি কে "আরবি ব্যাকরণের জনক" হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

পরবর্তীতে বাসরান স্কুল অফ আরবি গ্রামার (Basran School of Arabic Grammar) নামে স্কুল প্রতিষ্ঠা হয় তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের রাজধানী বুসরাতে। এরপর দেখা গেল, মানুষ কুরানের গ্রামার বুঝলেও সঠিক কুরআন উচ্চারন করতে পারছিল না। তারপর এই স্কুলের ছাত্র আল খলিল ইবনে আহমদ (রহিমাহুমুল্লাহ) এরাবিক মাখরাজের আবিষ্কার করেন।

এরপর দেখা গেল, অনারবরাও আরবদের মত সঠিক উচ্চারন করে কুরআন তেলোয়াত করতে পারে। কিন্তু, সমস্যা দেখা দিল, আরবরা যে সেন্সে কুরাআন বুঝতে পারত, অনারবরা সে সেন্সে কুরআন বুঝতো না। কারন এরাবিক একটা শব্দকে অন্য ভাষার আরেকটা শব্দ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যায় না। কেননা, এরাবিক একেকটা শব্দ একেকটা আইডিয়া। তাই বলা হয়, কুরানের এক একটা শব্দ এক একটা রচনা বা গল্প।

এরপর আল খলিল ইবনে আহমদ (রহিমাহুমুল্লাহ) এরাবিক অভিধান লেখা শুরু করেন, কুরানের প্রতিটা শব্দ নিয়ে। "কিতাব আল আইন" তার বিখ্যাত অভিধান এবং তাকে এরাবিক অভিধানের জনক বলা হয়। এরপর প্রথম চারশত বছর অনেক বিখ্যাত এরাবিক অভিধান মুসলিম স্কলাররা তৈরি করে। তারা কুরাইশ গোত্রে চলে যাইতো, তারা দেখতো, আরবরা প্রেক্টিক্যালি কি অর্থে শব্দটা ব্যবহার করতেছে। তারা অভিধানে সে শব্দ গুলোর প্র্যক্টিক্যাল ব্যবহার সহ নিয়ে আসছে।

কিছু কিছু কুরআনের অনুবাদের বিকৃতি এবং প্রথম ৪ শতাব্দীতে কুরানের তাফসীর না থাকার কারণ??

আমরা অনেকে মনে করি, কুরানের প্রতিটি শব্দের অনেকগুলো অর্থ হয়।কিন্তু আমরা যদি প্রতিটি শব্দের গল্পটা জানি ও আইডিয়াটা বুঝি, দেখবেন কুরানের একটা শব্দের একটাই সিঙ্গেল আইডিয়া। যদি আপনি সঠিক ধারণাটি জানেন, তবে কুরআনের যে কোনো আয়াতে সেই শব্দটি খুঁজে পেলে মিলিয়ে দেখবেন, দেখবেন সব আয়াতকে ধারনাটি "সেটিসফাই" করতে পারছে।

যেমন: অনেকে মনে করে যে ‘ইলাহ’ শব্দ দিয়ে আল্লাহকে বোঝায়। কিন্তু কুরআনের আয়াতগুলোতে যেখানে ‘ইলাহ’ শব্দ পাবেন, সেখানে ইলাহ শব্দকে ‘আল্লাহ’ দিয়ে রিপ্লেস করলে দেখবেন, সূরা ফুরকান ২৫:৪৩ আয়াতে এসে মিলছে না। কেন মিলছে না? আল্লাহ বলেন-

"তুমি কি তাকে দেখেছ, যে নিজ ইচ্ছাকে তার ইলাহ বানিয়েছে?"

(সূরা ফুরকান, আয়াত ৪৩)

এখান ‘ইচ্ছা’ কীভাবে আল্লাহ হতে পারে?

এর মানে আপনার ধারণা ভুল যে -ইলাহ মানে আল্লাহ।

ক্লাসিকাল ডিকশনারী দেখলে বুঝতে পারবেন, ‘ইলাহ’ হল—যার আনুগত্য মেনে মানুষ কাজ করে, তিনি ইলাহ, এটা মন হতে পারে, নেতা হতে পারে, বাবা-মা, সরকার হতে পারে।

কিন্তু মুমিনদের ইলাহ একমাত্র আল্লাহ—কেননা তারা আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য করে না।

দেখবেন,এই অর্থ অনুযায়ী, কুরআনের সব আয়াত মেলে।

কুরআনে কোনো শব্দের একাধিক বা ডাবল আইডিয়া নেই (এরাবিক হারফ বাদে), কারণ হারফের নিজস্ব অর্থ নেই, এটি ইংরেজি প্রিপোজিশনের মতো।

উদাহরণস্বরূপ: আল্লাহ বলেন-

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ"

হে মুমিনগণ, তোমরা 'রা'ইনা'* বলো না; বরং বল, 'উনজুরনা'

(আল-বাকারা ২:১০৪)

এই আয়াতের 'রাইনা' শব্দের দুটি অর্থ ছিল: একটির মানে 'আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখো এবং ধীরে বলো', আর অন্যটির মানে ছিল 'বোকা'। কিন্তু 'উনসুরনা' ব্যবহার করলে একক ধারণা প্রকাশ পায়: 'আমাদের প্রতি নজর দিন'। আল্লাহ একক ধারণার শব্দ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রথম চার শতাব্দীতে কুরআনের কোনো প্রসিদ্ধ তাফসীর পাওয়া যায়নি; শুধুমাত্র ডিকশনারী ছিল যা কুরআনের প্রতিটি শব্দের একক ধারণা ব্যাখ্যা করেছিল। কিন্তু ৪০০ হিজরির পর থেকে, ডিকশনারীতে একাধিক ধারণার ব্যবহার দেখা যায় এবং তাফসীর লেখার প্রবণতা শুরু হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামের সোনালী যুগে তাফসীর কেন লেখা হয়নি? কেন সবাই শুধু ডিকশনারী লিখলো? কুরআন বারবার বলেছে যে, এটি স্পষ্ট এবং সহজভাবে বর্ণিত হয়েছে:

"আর আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ।"

(আন-নাহল ১৬:৮৯)

"আর আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?"

(আল-কামার ৫৪:১৭)

যেহেতু আল্লাহ কুরআনকে স্পষ্ট এবং সহজভাবে বর্ণনা করেছেন, সেটাকে আপনি কিভাবে আরও স্পষ্ট করবেন? আল্লাহর বর্ণনাকে কি মানুষ আরো উন্নত ও স্পষ্ট করতে পারবে, যেখানে আল্লাহ তাকে সহজ এবং স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন? নাকি অর্থের বিকৃতি ঠেকানোর জন্য তাফসীরকারীরা তাফসীর লেখা শুরু করেছিলেন? অথবা, একটা আয়াতের অন্য রেফারেন্স আয়াতগুলো ফোকাসে আনার জন্য করেছিলেন?

যাইহোক,তৎকালীন আরবরা কোরআনকে যে অর্থে বুঝতো, তা না বুঝলে আমরা কোরআন সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারবো না।

রেফারেন্স

এই বইয়ে আমরা সেইসব ডিকশনারি এবং গবেষণাগুলো থেকে সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা করেছি। নীচে উল্লেখিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসের নাম দেওয়া হলো, যেগুলো থেকে এই বইয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে:

১. **আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:),** গারিব আল কুরআন আন ফি শিরাল-আরব (মৃত্যু: ৬৮৭ খ্রিস্টাব্দ/৬৮ হিজরি): কোরআনের শব্দের বিশ্লেষণমূলক কাজ।

২. **আল খলিল ইবনে আহমদ (রহিমাহুমুল্লাহ),** কিতাব আল আইন (মৃত্যু: ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ/১৬৯ হিজরি): আরবি ভাষার অভিধান এবং মাখরাজের জনক হিসেবে পরিচিত।

৩. **আল-আসমা-ই (রহিমাহুমুল্লাহ),** ইশতিকাক আল আসমা (মৃত্যু: ৮৩১ খ্রিস্টাব্দ/২১৫ হিজরি): শব্দের শাব্দিক গঠন এবং অর্থ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা।

৪. **ইবনে ফারিস,** মাকাইস আল লুগাহ (মৃত্যু: ১০০৪ খ্রিস্টাব্দ/৩৯৪ হিজরি): আরবি ভাষার শব্দগুলির মাপকাঠি নিয়ে একটি বিশদ কাজ।

এইসব প্রাচীন অভিধান এবং গবেষণাগুলো আরবি শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং প্রেক্ষাপট বুঝতে সাহায্য করে, যা কোরআনের সঠিক অর্থ উপলব্ধি করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গুগলে "Arabic lexicon" বা "Arabic dictionary" লিখে সার্চ করে এই অভিধান গুলো পাওয়া যায়। http://arabiclexicon.hawramani.com/ একটা প্রশিদ্ধ ক্লাসিকাল অভিধানের সাইট।

এই বইটি লেখার জন্য আরও কিছু মূল্যবান রেফারেন্স ব্যবহার করা হয়েছে, যেগুলোতে লেখকরা বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন "Word matter" অর্থাৎ কুরআনের প্রতিটি শব্দকে সঠিকভাবে বোঝার প্রয়োজনীয়তায়। উল্লেখিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই এবং তাদের লেখকদের নাম নিচে দেওয়া হলো:

১. **কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা** - ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহিমাহুল্লাহ): কুরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে আকীদাহর বিস্তারিত বিশ্লেষণ।

২. **আকিদাহ আত-তাওহীদ** - ড. সালিহ আল ফাওযান: তাওহীদের ব্যাখ্যা এবং ইসলামের মূল আকীদা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।

৩. **কোরানের চারটি মৌলিক পরিভাষা** - সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী (রহিমাহুল্লাহ): কুরআনের চারটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

৪. **মাইলস্টোন (Milestones)** - সাইয়্যেদ কুতুব (রহিমাহুল্লাহ): ইসলামের সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে লেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ বই।

৫. **আল উবুদিয়াহ** - ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ): আল্লাহর বান্দাহ হিসেবে মানুষের দায়িত্ব ও কৃতজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে লেখা।

৬. **কিতাবুল ইমান** - মুফতী মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন: ইসলামের বিশ্বাসের মূল বিষয়গুলো নিয়ে লেখা একটি বই।

এই বইগুলোতে প্রতিটি শব্দের গভীরতা এবং সঠিক অর্থ বোঝার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, যা এই গ্রন্থের মূল লক্ষ্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

২য় অধ্যায়-মৌলিক পরিভাষা

ইবাদত

- ইবাদত: খুশি মনে আনুগত্য মেনে যে কাজ হয় সেই কাজকেই ইবাদত বলে। ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহ্‌র আনুগত্য মেনে যে কাজ হয়, সেটাকে আল্লাহ্‌র ইবাদত বলে।

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ও অভিধান প্রণেতা হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (মৃত্যু ৩৯৫ হিজরী) তার বিখ্যাত গ্রন্থ "মাকায়িস আল-লুগাহ" তে এই শব্দের সংজ্ঞাতে লিখেনঃ

(عَبَدَ) الْعَيْنُ وَالْبَاءُ وَالدَّالُ أَصْلَانِ صَحِيحَانِ، كَأَنَّهُمَا مُتَضَادَّانِ، وَ [الْأَوَّلُ] مِنْ ذَيْنِكَ الْأَصْلَيْنِ يَدُلُّ عَلَى لِينٍ وَذُلٍّ، وَالْآخَرُ عَلَى شِدَّةٍ وَغِلَظٍ।

"আবদ (عَبَدَ) শব্দের অক্ষর 'ع' (আইন), 'ب' (বা), এবং 'د' (দাল) দিয়ে গঠিত শব্দটির মধ্যে দুটি মূল একসাথে আছে, কিন্তু মূল দুটি পরস্পর বীপরিত মনে হলেও এই দুটি এক সাথে মিলে ইবাদতের অর্থ তৈরি করে। প্রথম মূল শব্দটি নরম ও নম্রতার ধারণা প্রকাশ করে, আর দ্বিতীয়টি কঠোরতা নির্দেশ করে।"

তাই বলা হয়, প্রথম মূলটি স্বেচ্ছায় আনুগত্য মেনে নেওয়ার ধারণা বোঝায়, আর দ্বিতীয়টি কঠোর কাজ বোঝায়। আর স্বেচ্ছায় আনুগত্য অনুযায়ী যে কাজটি কঠোরভাবে পালন করা হয়, সে কাজকে ইবাদত বলে।।

দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ, পৃথিবীর সর্বপ্রথম অভিধান প্রণেতা ও এরাবিক মাখরাজের জনক আল খলিল (রহিমাহুল্লাহ) (১০০ -১৭০ হি) তার বিখ্যাত অভিধান কিতাব আল আইনে বলেন -"আল-আবদ" (العبد) হলো মানুষ, পৃথিবীতে সে হতে পারে স্বাধীন বা কারো অধীন (কিন্তু সে কারো না কারো দাস)।

আল-আবদ" (العبد) দুই রকমের হতে পারে:

সে আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য মেনে কাজ করে না।

অথবা

তার মন যখন যার আনুগত্যের ব্যাপারে সায় দেয়, সে তার আনুগত্য মেনে নিয়ে কাজ করে।

তিনি আরও বলেন-সাধারণ জনগণ আবাদুল্লাহ (عباد الله) এবং আল-আবদ (العبيد) এর মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করেছে।

عباد الله (আবাদুল্লাহ): যারা স্বেচ্ছায় শুধুমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করে কাজ করে। [এ বিষয়ে আয়াত

পাবেন - আল-ইনসান ৭৬:৬, সুরা ফুরকান ২৫:৬৩]

আর, العبيد (আল-আবদ): যারা স্বেচ্ছায় কখনো আল্লাহর আবার কখনো অন্য কারো আনুগত্য মেনে কাজ করে। হতে পারে মন, হতে পারে সরকার, বাবা-মা, ধর্মীয় আলেম, তাগুত, নেতা অথবা বন্ধুর।" [রেফারেন্স আয়াত পাবেন

সুরা ইয়াসিন ৩৬:৬০, সুরা ফুরকান ২৫:৪৩, সুরা আস-সাফফাত ৩৭:২২-২৩]

পৃথিবীতে এই দুটি শ্রেণির বাইরে কোনো মানুষ নেই; প্রতিটি মানুষ এই দুই শ্রেণির যে কোনো একটিতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

তাহলে, ইবাদত কাকে বলে?

মানুষ ও জীন আনুগত্য মেনে যে কাজটা করে সে কাজকে ইবাদত বলে।

মানুষ যদি শুধুমাত্র আল্লাহর আনুগত্য মেনে কাজ করে, সে আল্লাহর ইবাদত করল অর্থাৎ সে আব্দুল্লাহ।

আর মানুষ বা জীন যদি মন সহ অন্য কারো আনুগত্য মেনে কাজ করে, সে অন্য কারো ইবাদত করল অর্থাৎ সে অন্য কারো আবদ।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট, ইবাদত এর মূল ধারণাটি দুটি অংশে বিভক্ত: প্রথমটি হলো আনুগত্য এবং তারপরেরটি হলো কাজ। অর্থাৎ, ইবাদত বলতে এমন কাজকে বুঝায় - যা সম্পাদিত হয় স্বেচ্ছায় কারো বা কোন কিছুর আনুগত্য করে।

এখন, যদি আপনি আনুগত্য মানেন না কিন্তু বাধ্য হয়ে কোনো কাজ করেন, তাহলে সেটি ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে না। আর যদি আপনি শুধুমাত্র আনুগত্য মেনে নেন কিন্তু তার অনুরূপ কাজ করেন না, তাও ইবাদত হবে না। সুতরাং, ইবাদত বলতে যা বুঝানো হয় তা হলো:

ইবাদত = আনুগত্য মেনে নেয়া + সে অনুযায়ী কাজ করা।

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, প্রকৃত ইবাদত তখনই হয় যখন কেউ আন্তরিকভাবে আনুগত্য স্বীকার করে এবং তার পর সেই আনুগত্য অনুযায়ী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

আল্লাহ বলেন-

ۚ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

"হে বনী আদম, আমি কি তোমাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দিইনি যে, 'তোমরা শয়তানের ইবাদত করো না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু'?" (সূরা ইয়াসিন ৩৬:৬০)

আমরা আল্লাহর ইবাদতের কথা জানি। এখন প্রশ্ন হলো, শয়তানের ইবাদত কেমন করে করা হয়? আল্লাহ রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি শয়তানের প্ররোচনায় রোজা না রাখেন, তাহলে তিনি শয়তানের ইবাদত করছেন।

আনুগত্য যার, ইবাদত হয়ে যায় তার জন্য । যদি কেউ শয়তানের কথা শুনে লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে, তাহলে তার ইবাদত শয়তানের জন্য হয়ে যাবে।

একটা আয়াত এবং তার সাথে সম্পর্কযুক্ত একটা হাদিস বলি, তাহলে বুঝতে আরো সহজ হবে-

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফরী দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের উপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব। ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় (কুফরির ঘোষনা দিতে অথবা জালেমদের মর্জি অনুযায়ী কাজ করতে) অথচ তার অন্তর থাকে ঈমানে পরিতৃপ্ত।

An-Nahl 16:106

আম্মার ইবনে ইয়াসির(রা.) চোখের সামনে তাঁর পিতা ও মাতাকে কঠিন শাস্তি দিয়ে দিয়ে শহীদ করা হয়। তারপর তাঁকে এমন কঠিন অসহনীয় শাস্তি দেয়া হয় যে, শেষ পর্যন্ত নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য তিনি কাফেরদের চাহিদা মত সবকিছু বলেন। এরপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হন এবং আরয করেনঃ

يَا رَسُولَ اللهِ مَا تُرِكتُ حَتَّى سَبَبْتُكَ وَذَكَرتُ اَلِهَتَهُم بِخَيرٍ

"হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে মন্দ এবং তাদের উপাস্যদেরকে ভাল না বলা পর্যন্ত তারা আমাকে ছেড়ে দেয়নি।"

রসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, كَيفَ تَجِدُ قُلبَكَ ؟ "তোমার মনের অবস্থা কি?" জবাব দিলেন, مُطمَئِنًّا بِالاِيمَانِ "ঈমানের ওপর পরিপূর্ণ নিশ্চিন্তে।" একথায় নবী ﷺ বললেনঃ اِن عَادُوا فَعُد "যদি তারা আবারো এ ধরনের জুলুম করে তাহলে তুমি তাদেরকে আবারো এসব কথা বলে দিয়ো।" [সুনান আবু দাউদ, সুনান আল বায়হাকি]

এইখান থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, আনুগত্য না মেনে কোন কাজ করলে তা ইবাদত হবে না। কেননা, পরিস্থিতির মুখে কুফরির ঘোষণা দিলেও, ইবাদতের সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট ইবাদত হতে হলে যে কাজটা করা হয় তা আনুগত্য মেনে করতে হয়।

তাগুত: তাগুত হল সে – যে আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে গিয়ে অবাধ্যতার সীমা অতিক্রম করে। অর্থাৎ দিনের পর দিন তার অবাধ্যতা প্রকাশ করে যেমনঃ নিষ্ঠুর শাসক।

তাহলে, যারা নিজে আল্লাহর আনুগত্য করে না এবং অন্যদেরও আল্লাহর আনুগত্য করতে নিষেধ করে, তাদেরকে তাগুত বলা যায়।

ধরুন, একটি দলের সভাপতি/নেতা। তার অধীনস্থ নেতাদেরকে বলল, "তোমরা তোমাদের কর্মীবাহিনী নিয়ে মানুষের উপর জুলুম করো, তাদের জমি দখল করে নাও।" আর নেতাকর্মীরা তাই করলো, যা সে নির্দেশ দিয়েছিল। দিনের পর দিন সে এই নিষ্ঠুরতা চালিয়ে যাচ্ছিল।

۞ اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ

"জালেমদেরকে, তাদের সহযোগীদের (নেতা-কর্মীদের) এবং আল্লাহ ব্যতীত যারা তাদের আনুগত্য করেছিল, তাদের একত্রিত করো; তারপর তাদেরকে জাহান্নামের পথে নিয়ে যাও।" (সূরা আস-সাফফাত ৩৭:২২-২৩)

- এখানে, সভাপতি হচ্ছে তাগুত, কারণ তিনি আল্লাহর আদেশের বিপরীতে গিয়ে বার বার অন্যায় কাজের আদেশ দিয়েছেন এবং মানুশজন তার ইবাদত করেছে।
- যারা তার আদেশ পালন করেছে, তারা জালেম।
- যারা জুলুম করতে সহযোগিতা করেছে, তারা জালেমের সাহায্যকারী।

এই তিন গ্রুপের স্থান হল জাহান্নাম।

যেখানে আল্লাহর আদেশ আছে, সেখানে আল্লাহর আনুগত্য মেনে নিয়ে সে অনুসারে কাজ করতে হবে, ঠিক যেমন রাসূলরা করেছেন। যদি আপনি আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে কাজ করেন, তাহলে আপনি আল্লাহর ইবাদত করছেন।

আর যদি আপনি আপনার মনের আনুগত্য, নেতার আনুগত্য অথবা পূর্বপুরুষের আনুগত্য মেনে নিয়ে কাজ করেন, তাহলে মূলত আপনি যার আনুগত্য করছেন, তারই ইবাদত করছেন।

মুসলমানদের ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আমরা মসজিদে গিয়ে সিজদাহ দিই, তারা তাদের মন্দিরে মূর্তির সামনে সিজদাহ দেয় অথবা মাথা নত করে। পার্থক্য হচ্ছে, আমরা যেটা করি, তার প্রমাণ কুরআনে আছে। আর তারা যেটা করে, তাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থে সেই কাজ করার নির্দেশনা আছে কিনা, সেটা প্রশ্ন করা উচিত।

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ

"আর তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে, যার জন্য আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি এবং যার ব্যাপারে তাদেরও কোনো জ্ঞান নেই। আর যালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।" (সূরা আল-হজ্জ ২২:৭১)

এখন, যদি আপনি কুরআনে বলা হয়নি এমন কিছু ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করে করেন, তাহলে সেটা আল্লাহর ইবাদত হবে না, বরং আপনার মন বা যার কথা অনুসারে করছেন, তার ইবাদত হবে।

আরেকটি উদাহরণ দিই: রোজা তো ইবাদত, তাহলে ইদের দিনে রোজা রাখা হারাম কেন?

ইবাদত মূলত সেটাই, যা আল্লাহ যেভাবে করতে বলেছেন, তা করা। যদি আপনি নিজের মনের মতো কিছু করেন, তাহলে সেটা আপনার মনের ইবাদত হবে।

তাহলে, আমরা কোনো শাসক, নেতা, বাবা-মা, অফিস বস অথবা জীবনসঙ্গীর আনুগত্য করতে পারি না। শুধু আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, যা তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ

"আর যারা তাগুতের ইবাদত পরিহার করে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব, আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দাও।" (সূরা আয-যুমার ৩৯:১৭)

তাহলে, মনে রাখতে হবে: ইবাদত একটি আরবি শব্দ। রাসূলের জন্মের আগেও মানুষ এই শব্দটি ব্যবহার করত। এর অর্থ হলো আনুগত্য মেনে কাজ করা।

ইবাদত যে কাউকে যে কেউ করতে পারে। কিন্তু এক আল্লাহর ইবাদত হল—আল্লাহ কুরআনে যা করতে বলেছেন, তা করা এবং যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা।

উপরের আলোচনা অনুযায়ী, মানুষ বিভিন্নভাবে ইবাদত করতে পারে, যা নীচে উল্লেখিত:

১। মনের ইবাদত:

- যদি কেউ আল্লাহর আদেশ মেনে না চলেই নিজের মনোভাব অনুসারে কাজ করে, তাহলে তার সেই কাজ আসলে তার মনেরই ইবাদত হবে, আল্লাহর নয়।

২। শাসক/সরকারের ইবাদত:

- যদি কেউ শাসক বা সরকারের নির্দেশ অনুসারে কাজ করে যা আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে, তাহলে তার সেই কাজ শাসকের ইবাদত হবে, আল্লাহর নয়।

৩। নেতার ইবাদত:

- যদি কেউ নেতার আদেশ পালন করে যেটি আল্লাহর নির্দেশনার বিরুদ্ধে, তাহলে তার সেই কাজ নেতার ইবাদত হবে, আল্লাহর নয়।

৪। অন্যদের ইবাদত:

- যদি কেউ তার বাবা-মা, অফিস বস, অথবা জীবনসঙ্গীর আদেশ পালন করে, যা আল্লাহর আদেশের সাথে সাংঘর্ষিক, তাহলে তার সেই কাজ ঐ ব্যক্তিদের ইবাদত হবে, আল্লাহর নয়।

সংক্ষেপে, ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশ মেনে চলার মাধ্যমে করা উচিত। অন্য কারো আদেশ যদি আল্লাহর আদেশের বিরোধী হয়, তাহলে সেটি আল্লাহর ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে না। আমাদের সমস্ত আনুগত্য ও ইবাদত আল্লাহর জন্য হওয়া উচিত, যেমনটি কোরআনে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন।

নোটঃ প্রশ্ন হলো, মানুষ মানুষকে যে দাস বানায় বা আগে যে দাস প্রথা প্রচলিত ছিল, তাদেরকে কি আল্লাহ মানুষের দাস বলেছে?

দুনিয়ার চোখে যারা স্বাধীন না অথবা যারা কারো অধীনে আছে বা দাস, তাদেরকে আল্লাহ পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন—"মা মালাকাত আইমানুকুম" অর্থাৎ যারা তোমাদের অধীনে আছে। (আন-নিসা ৪:৩৬, আন-নাহল ১৬:৭১)।

কুরআনে আল-আবদ (العبد) শব্দটি আমরা প্রচলিত যে দাস-দাসী বুঝি, সে অর্থে একবারও ব্যবহার হয়নি।

"আল-আবদ" (العبد) এর যে ধারণা, সেখানে জোর করে কাউকে দিয়ে কিছু করানোর বিষয়টা নেই। আবদ সবসময় স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করে।

আর, "মা মালাকাত আইমানুকুম" যারা, তারা স্বাধীন না হওয়ায় তাদের হিসাব আলাদা। তারাও "আল-আবদ" (العبد), কিন্তু তারা কারো না কারো অধীনে থাকে। এই কারণে কুরআনে শাস্তির বিধান যারা “মা মালাকাত আইমানুকুম,” তাদের জন্য ভিন্ন, ক্ষেত্রবিশেষে অর্ধেক। (এই বিষয়ে আয়াত পাবেন আন-নিসা ৪:২৫)।

কালেমার শাব্দিক অর্থ

লা

দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ, পৃথিবীর সর্বপ্রথম অভিধান প্রণেতা ও এরাবিক মাখরাজের জনক আল খলিল (রহিমাহুল্লাহ) (১০০ -১৭০ হি) তার বিখ্যাত অভিধান কিতাব আল আইনে বলেন -

আরবিতে **"লা" শব্দটি প্রত্যাখ্যান করা অথবা মানি না** এইরূপ অর্থে ব্যবহার হয়।

ইলাহ

- ইলাহ: খুশিমনে আনুগত্য মেনে যার জন্য কাজ করা হয় তাকে ইলাহ বলে। আর, যারা শুধুমাত্র এক আল্লাহ্র আনুগত্য খুশিমনে মেনে কাজ করে, তাদের ইলাহ শুধুমাত্র আল্লাহ।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন- ইলাহ শব্দের অর্থ হলো "মাবুদ"। যার ইবাদত করা হয় তাকে মাবুদ বলা হয়। অর্থাৎ, যার আনুগত্য মেনে নিয়ে মানুষ সেই অনুসারে কাজ করে, তাকে ইলাহ বলা হয়।

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ও অভিধান প্রণেতা হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (মৃত্যু ৩৯৫ হিজরী) তার বিখ্যাত গ্রন্থ “মাকায়িস আল-লুগাহ” তে এই শব্দের সংজ্ঞাতে লিখেনঃ

"হামজা, লাম ও হা= ইলাহ: ধাতুটির একটিই মূল অর্থ, তা হলো যিনি মাবূদ। আল্লাহ ইলাহ, কারন মানুষ তার ইবাদত করে।[ইবনু ফারিস, মু'জামু মাকাইসিলুগাহ ১/১২৭]

আরবি ভাষায় সব পূজিত ব্যক্তি, বস্তু বা দ্রব্যকেই 'ইলাহ' বলা হয়। [ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহিমাহুল্লাহ), কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা ৯৩]

তৎকালীন আরবরা যাদের কথা অনুসারে চলত, তাদেরকেই তারা 'ইলাহ' ডাকতো। আবু জেহেল, আবু লাহাব সহ যাদের কথায় তারা মানত, তাদেরকেও 'ইলাহ' ডাকতো।

আপনি আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে যাদের আনুগত্য করেন, তারা সকলেই 'ইলাহ' হতে পারে। ইলাহ হতে পারে শাসক, মন, বাবা-মা, ভাই-বোন, আলেম, বন্ধু, মূর্তি, নেতা—যেকোনো কিছু।

তাই বলা হয়,

Ilah is someone or something you obey and act in accordance with that obedience. Or, Ilah is an authority you accept as absolute and act in accordance with that authority.

অর্থাৎ ইলাহ হলো এমন কেউ বা কিছু, যার আনুগত্য আপনি মেনে চলেন এবং সেই আনুগত্য অনুযায়ী কাজ করেন। অথবা, ইলাহ হলো এমন একটি কর্তৃত্ব, যাকে আপনি চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করেন এবং সেই কর্তৃত্ব অনুযায়ী কাজ করেন।

আসুন কুরআন থেকে দেখি:

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰـهَهٗ هَوٰىهُ ۗ

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার মনকে ইলাহ বানিয়েছে?"

Al-Furqan 25:4

মন কিভাবে ইলাহ হয়? সহজভাবে বলতে গেলে, যদি আপনার মন বলে মদ খাও, আর আপনি মনের আনুগত্য মেনে মদ খান, তাহলে আপনার মন আপনার ইলাহ হয়ে যায়।

যদি আপনার অফিস বস বলেন, "ওজনে কম দাও," আর আপনি সেটা করেন, তাহলে বস আপনার ইলাহ হয়ে যান।

অন্যদিকে, যদি আপনি শাসকের আনুগত্য মেনে কাজ করেন, তাহলে শাসকও ইলাহ হয়ে যায়।ভ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ

"আর ফির‘আউন বলল, ‘হে পারিষদবর্গ, আমি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ আছে বলে জানি না।’"

Al-Qasas 28:38

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰـهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ

"ফির‘আউন বলল, ‘যদি তুমি আমাকে ছাড়া কাউকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ কর, তাহলে আমি তোমাকে কয়েদীদের অন্তর্ভুক্ত করব।’"

Ash-Shu'ara' 26:29

ফেরাউন নিজেকে আল্লাহ দাবি করে নাই, এই দাবি কেও করতেও পারে না; বরং সে নিজেকে ইলাহ দাবি করেছে যে, তার কথামত মিশরের সবাইকে চলতে হবে।

শাসকদেরও ইলাহ থাকতে পারে। ধরুন, আমি বাংলাদেশের সরকার প্রধান। মানুষ আমার কথা শুনে, কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পরিপন্থি ভারত বা আমেরিকার কথামত চলি। তাহলে আমার ইলাহ হবে ভারত বা আমেরিকা।

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰي وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ؕ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ

"আর ফির'আউনের কওমের সভাসদগণ বলল, 'আপনি কি মূসা ও তার কওমকে ছেড়ে দেবেন যাতে তারা যমীনে ফাসাদ করে এবং আপনাকে ও আপনার ইলাহদেরকে বর্জন করবে?'"

Al-A'raf 7:127

এখানে দেখা যাচ্ছে, ফির'আউনেরও অনেক ইলাহ ছিল।

ইলাহ হতে পারে মূর্তি, হতে পারে সূর্যও। তাই, সূর্যের আরেক নাম 'ইলাহাহ'।

এখন প্রশ্ন হলো, মূর্তি তো জড় পদার্থ, তা কিভাবে আনুগত্য নেয়? আসলে, মূর্তি আনুগত্য নিতে পারে না, কিন্তু মানুষ মনে মনে বিশ্বাস করে যে, মূর্তিটি আনুগত্য নিচ্ছে এবং এটা ওটা করতে বলেছে।

এই কারণে কুরআনে সরাসরি মূর্তিকে ইলাহ বলা হয়নি:

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً

"আর (স্মরণ কর) যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বলেছিল, 'তুমি কি মূর্তিগুলোকে ইলাহরূপে গ্রহণ করছ?'"

Al-An'am 6:74

এটি মূলত একটি টিসকারী মূলক কথা যে, তোমার আচরণ দেখে মনে হচ্ছে মূর্তি তোমার আনুগত্য নিচ্ছে এবং মূর্তি তোমাকে এটি করতে বলেছে , অথচ তা কেবল জড় পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইলাহ হতে পারে এমন বিষয়সমূহ

১. মানবীয় কর্তৃত্ব:

- **শাসক:** যদি কেউ শাসকের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে আল্লাহর গাইডেন্সের বিপরীত কিছু করে, তাহলে সেই শাসক তার ইলাহ হয়ে যায়।
- **অফিস বস:** অফিস বসের নির্দেশে আল্লাহর নির্দেশনার বিপরীত কিছু করলে, বসের আনুগত্যের মাধ্যমে বস ইলাহ হয়ে যায়।

২. পারিবারিক সদস্য:

- **বাবা-মা:** যদি বাবা-মা এমন কিছু করার নির্দেশ দেন যা আল্লাহর নির্দেশনার বিপরীত, এবং কেউ তাদের নির্দেশ অনুসরণ করে, তাহলে বাবা-মা ইলাহ হয়ে যায়।

৩. নবী এবং আলেমদেরকে

খ্রিস্টানদের কিছু মতবাদ অনুযায়ী, ঈসা (আঃ) কে রব এবং ইলাহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যদিও ঈসা (আঃ) কখনও নিজেকে রব দাবী করেননি এবং ইলাহও দাবী করেননি, কিছু মানুষ মিথ্যা হাদিস এবং গুজবের মাধ্যমে তাকে "রব এবং

ইলাহ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কুরআন অনুযায়ী, ঈসা (আঃ) নিজেকে ইলাহ দাবি করেননি:
ۖ وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَي ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

আর যখন (হাশরের দিন) আল্লাহ বলবেন, "হে মরিয়মপুত্র ঈসা! তুমি কি মানুষকে বলেছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা আমাকে ও আমার মাকে ইলাহ বানাও?"
(সূরা আল-মায়িদাহ ৫:১১৬)

আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন—

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰـهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

যে বিষয়ে আল্লাহ নিজেকে রব দাবি করেছে, সেবিষয়ে তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের (ধর্মীয় আলেম) যাজক ও পাদ্রীদেরকে এবং মরিয়মের পুত্র (তাদের নবী ঈসা) মসীহকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।অথচ তাদেরকে একেবারেই কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নাই যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে। (কেননা), আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (বা আনুগত্য মেনে কাজ পাওয়ার যোগ্য কেও) নাই। আল্লাহ সকল অযোগ্যতা থেকে মুক্ত, তা সত্বেও তারা আল্লাহর সাথে অনেককে অংশীদার করে।
(আল-কুরআন, আত-তাওবাহ ৯:৩১)

৪. **অন্যরা:**

- **বউ/স্বামী:** যদি জীবনসঙ্গী এমন কিছু করতে বলেন যা আল্লাহর গাইডেন্সের বিপরীত, এবং কেউ সেই নির্দেশ অনুসরণ করে, তাহলে জীবনসঙ্গীও ইলাহ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
- **বাচ্চা:** সন্তানদের জন্যও যদি কেউ আল্লাহর নির্দেশনার বিপরীত কিছু করে, তাহলে সন্তানের নির্দেশনা অনুসরণও ইলাহ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

জড় পদার্থের আনুগত্যের ধারণা

জড় পদার্থ যেমন মূর্তি বা সূর্য নিজে আনুগত্য নিতে পারে না। তবে, কিছু মানুষ যদি মনে করে যে এই জড় পদার্থ তাদের নির্দেশ দিচ্ছে, তখন তারা ওই পদার্থকে ইলাহ হিসেবে মনে করে।

- **মূর্তি:** মূর্তিগুলি কিছু করতে পারে না, কিন্তু যদি কেউ বিশ্বাস করে যে মূর্তি তার জন্য নির্দেশনা প্রদান করছে এবং সেই অনুযায়ী সে কাজ করে, তাহলে সে মূর্তিকে ইলাহ হিসেবে গণ্য করছে।
- **সূর্য বা অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদান:** সূর্য বা অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদান নিজে কিছু করতে পারে না, কিন্তু যদি কেউ মনে করে যে এগুলি তার জন্য নির্দেশনা প্রদান করছে এবং সেই অনুযায়ী সে কাজ করে, তাহলে সে ওই পদার্থকে ইলাহ হিসেবে গণ্য করছে।

আল্লাহ কুরআনে যে গাইডেন্স প্রদান করেছেন, তার বিপরীতে কিছু করা এবং জড় পদার্থকে ইলাহ হিসেবে ভাবা, এসবই ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যায়। মূল বিষয় হলো, আল্লাহর নির্দেশনার বাইরে কিছু করলে এবং জড় পদার্থকে আনুগত্য করার বিশ্বাস করলে, তা ইলাহর আনুগত্য হিসেবে গণ্য হয়।

ইল্লা

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ও অভিধান প্রণেতা হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (মৃত্যু ৩৯৫ হিজরী) তার বিখ্যাত গ্রন্থ "মাকায়িস আল-লুগাহ" তে এই শব্দের সংজ্ঞাতে লিখেনঃ আরবরা **কোন বিষয়/ কোন কিছু আলাদা করে সংরক্ষণ করে রাখা** অর্থে "ইল্লা" শব্দের ব্যবহার করত।

ইবনু ফারিস আরও বলেন- আরবরা "ইল্লা" শব্দটি বিশেষ কিছু সংরক্ষণ বা আলাদা করে রাখা অর্থে ব্যবহার করত। উদাহরণস্বরূপ, সেনাবাহিনীর বিশেষ বিশেষ জায়গায় আমাকে আপনাকে ঢুকতে দিবে না, কারন তা কিছু নির্দিষ্ট মানুষের জন্য সংরক্ষিত।

এখানে "ইল্লা" শব্দটি বোঝায় যে, ইলাহ শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং অন্যদের ইলাহ মানা যাবে না।

আল্লাহ

আর, আল্লাহ হচ্ছেন তিনি, যিনি বিশ্বজগতের রব।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۙ

সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্ব জগতের রব।

Al-Fatihah 1:2

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অর্থ

উপরের বর্ণনা অনুযায়ী, কালেমার প্রতিটি শব্দের ধারণা পাওয়ার পর কালেমার অর্থ দাঁড়ায় -

কোন ইলাহ মানি না আল্লাহ ছাড়া। অর্থ্যাৎ স্বেচ্ছায় আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য মেনে কাজ করব না।

আল্লাহ বলেন-

وَمَاۤ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا نُوۡحِیۡۤ اِلَیۡہِ اَنَّہٗ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدُوۡنِ

আর তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, 'আমি ছাড়া কোন ইলাহ/আনুগত্য মেনে কাজ পাওয়ার যোগ্য কেও নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদাত/ আনুগত্য মেনে কাজ কর।'

Al-Anbiya 21:25

পৃথিবীতে যত নবী ছিলেন, তাদের সকলের বার্তা ছিল এই একটাই— আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, /শুধু আল্লাহর আনুগত্য মেনে চলতে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো আল্লাহ ছাড়া যদি আপনি কারো আনুগত্য না মানেন, তাহলে দুনিয়াতে চলবেন কিভাবে? এই প্রশ্নটা আরবদেরও ছিল -

اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ
‘সে কি সকল ইলাহকে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? নিশ্চয় এ তো এক আশ্চর্য বিষয়!’
[আল কোরআন,**সাদ ৩৮:৫]**

যে পরিস্থিতিতেই পড়েন না কেন, সেই বিষয়ের জন্য কুরআনের দিকনির্দেশনা রয়েছে। এই কারণেই কুরআনে অনেক নবীর জীবনী বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করার সুযোগ নেই, সুতরাং কালেমা প্রতি কাজেই আপনাকে কুরআনের কাছে যেতে বাধ্য করবে যে, এই কাজের জন্য কুরআনে কী নির্দেশনা আছে, ঐ কাজের জন্য কী নির্দেশনা আছে।

আল্লাহ বলেন:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا
আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে ইসলামকে পছন্দ করলাম।

আল-মায়িদাহ ৫:৩

তাহলে বলা যায়, কখনো কুরআন সরাসরি করণীয় বলে দেয়, কখনো কাজের কৌশল বলে দেয়। আপনি যাই করুন, কুরআনের রেফারেন্সে কাজ করতে হবে। এই কারণে, কালেমাকে বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিদ্রোহী বাক্য। যা তার বাবা-মা, নেতা, সরকার সহ সকলের আনুগত্য অস্বীকার করে।

তেমনিভাবে আলেমদের আনুগত্য, জাল হাদিসের আনুগত্য, যেটার ব্যাপারে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাজিল করেননি, সেটার আনুগত্যও করা যাবে না।

اِتَّخَذُوْۤا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَعْبُدُوْۤا اِلٰـهًا وَّاحِدًا ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

যে বিষয়ে আল্লাহ নিজেকে রব দাবি করেছে, সেবিষয়ে তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের (ধর্মীয় আলেম) যাজক ও পাদ্রীদেরকে এবং মরিয়মের পুত্র (তাদের নবী ঈসা) মসীহকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।অথচ তাদেরকে একেবারেই কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নাই যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে। (কেননা), আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (বা আনুগত্য মেনে কাজ পাওয়ার যোগ্য কেও) নাই। আল্লাহ সকল অযোগ্যতা থেকে মুক্ত, তা সত্বেও তারা আল্লাহর সাথে অনেককে অংশীদার করে।

(আল-কুরআন, আত-তাওবাহ ৯:৩১)

এখন আপনি যদি মনে করেন আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ইলাহ মানবেন অথবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ইলাহ মানবেন, তাহলে আল্লাহ বলেন:

الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقُوهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ
যে আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ গ্রহণ করেছিল, তাকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ কর।

কাফ ৫০:২৬

আমরা অনেকেই মনে করি, আল্লাহ কুরআনে বাবা-মা, নেতা, হাসবেন্ডদের আনুগত্য করতে বলছেন। কিন্তু কুরআনের কোথাও আপনি তা খুঁজে পাবেন না।

সবাই উদাহরণ হিসেবে একটি আয়াত নিয়ে আসে, সেটি হল:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ
হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে আদেশকারী অভিভাবকদের।

আন-নিসা ৪:৫৯

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোন আদেশ? অভিভাবকরা যদি মূর্তিপূজা করতে বলে, করবেন?

এটি হচ্ছে সেই আদেশ যা আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশের মধ্যে থাকে। যে আদেশ, কুরআনের বিপক্ষে যায় না।

এই আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে, আরব সরকারসহ অনেক নামধারী মুসলিম শাসক তাদের অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বলা হারাম ঘোষণা করেছে। নেতা, শাসক, অভিভাবক কুরআনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার পরও যদি আমরা কথা না বলি, তাহলে মূসা নবীসহ সকল নবী সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন কেন?

মনে রাখবেন, কুরআনের প্রতিটি আয়াতের স্বপক্ষে রেফারেন্স আয়াত থাকে। যদি কোনো আয়াত অন্য আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়, বুঝতে হবে কোথাও আপনার বুঝার ভুল হচ্ছে।

আল্লাহ বলেন:

وَاَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ
আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য (দুনিয়াতে) বাস্তবায়ন করো।

আত-তালাক ৬৫:২

এখন প্রশ্ন হলো কোন সাক্ষ্য? আপনি ন্যায়ের পথে যে সাক্ষ্য দেন সকল সাক্ষ্যই এর অন্তর্ভুক্ত। আর, মুমিনের সবচেয়ে বড় সাক্ষ্যই হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য মানা যাবে না এই সাক্ষ্যটি যেটি জেনে বুঝে ঘোষণা দেয়ার মাধ্যমে ইমান আনতে হয় , সুতরাং এ সাক্ষ্যকে দুনিয়ার জীবনে বাস্তবায়ন করা আপনার আমার সবার জন্য ফরজ।

এই সাক্ষ্য বাস্তবায়নের অর্থ হল- মুখে যে ঘোষনাটা দিচ্ছেন- আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য মানেন না, ব্যক্তি জীবনেও কুরআনের দিকনির্দেশনার বাহিরে কোন কাজ করা যাবে না। সমাজে, রাষ্ট্রে এমনকি সারাপৃথিবীর মানুষ যাতে শুধুমাএ এই কালেমার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাইতে হবে।

আর এই কালেমার সাক্ষ্যটি দুনিয়াতে বাস্তবায়ন করতে পারলে সকল অশান্তির অবসান হবে।

সরকার যদি পুলিশকে আদেশ দেয়, নিরাপরাধ মানুষকে গুলি করতে, পুলিশ তা করবে না, যদি করে সরকার ইলাহ হয়ে যাবে। মানুষ যখন এই ভাবাদর্শ লালন করবে, তখন কোন সরকার স্বৈরশাসক বা তাগুত হতে পারবে না।

আপনার স্ত্রী আপনার বাবা-মায়ের দেখাশোনা না করতে বললে, আপনি তা শুনবেন না। শুনলে আপনার স্ত্রী আপনার ইলাহ হয়ে যাবে।

আপনি আপনার স্ত্রীর কাছে যৌতুক চাইলে, সে আপনাকে মানবে না।

আপনার বাবা-মা আপনার কাছে অন্যায় আবদার করলে, আপনি শুনবেন না, শুনলে বাবা-মা ইলাহ হয়ে যাবে।

কালেমা প্রতি কাজে আপনাকে কুরআনের কাছে যেতে বাধ্য করবে।

এখন, কালেমায় যে সাক্ষী দেন, সেটা কিভাবে কায়েম/বাস্তবায়ন করবেন?

সোজা উত্তর, আল্লাহর জমীনে আল্লাহ ছাড়া মানুষ কারো আনুগত্য যাতে না করে তার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

রাসুলের জীবনী থেকেও আমরা জানি যে, রাসুল শুধুমাত্র একটি জিনিসের দিকে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন। মক্কার সকল নেতাকে উদ্দেশ্য করে রাসুল (স) বলেছেন:

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: نَعَمْ، كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تُعْطُونِيَهَا تَمْلِكُونَ بِهَا الْعَرَبَ، وَتَدِينُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: نَعَمْ وَأَبِيكَ، وَعَشْرَ كَلِمَاتٍ. قَالَ: تَقُولُونَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَتَخْلَعُونَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ. قَالَ: فَصَفَقُوا بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ قَالُوا: أَتُرِيدُ مُحَمَّدُ أَنْ تَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا؟ إِنَّ أَمْرَكَ لَعَجَبٌ.

"যদি তোমরা আমাকে একটি কথা মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার দাও তাহলে তোমরা সেই একটি কথার মাধ্যমে গোটা আরব বিশ্বের মালিক বনে যাবে এবং অনারব বিশ্ব হয়তো তোমাদের দ্বীন/তোমরা যা মেনে চল তা গ্রহণ করবে অথবা তোমাদের কর দিয়ে থাকবে।" এ কথা শুনে আবু জাহল বললো, "অবশ্যই! তোমার পিতার কসম, আরো দশটি কথা মানবো।" রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, "সেই একটি কথা হলো তোমরা বলবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'/ আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য মেনে কাজ করব না। এক আল্লাহর ইবাদত/আনুগত্য মেনে কাজ করবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছুর ইবাদত/আনুগত্য মেনে কাজ করা হয়, সবকিছুকে ত্যাগ করবে।" এ কথা শুনামাত্র সকলেই হাতে তালি দিতে শুরু করলো আর বললো, "হে মুহাম্মাদ, তুমি কি আমাদের সকল ইলাহকে/যাদের আনুগত্য মেনে কাজ করা হয় এমন সকলকে এক আল্লাহতে কেন্দ্রীভূত করতে চাও? তোমার ব্যাপারটি বড় আশ্চর্যজনক।" (সীরাত ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮০)

মক্কার লোকেরা এই যে কালিমার বিরোধিতা করেছিল, এটা কিন্তু তারা জেনে বুঝেই করেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে এই কালিমা গ্রহণ করার অর্থ হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো আনুগত্য করা যাবে না। আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কোনো নেতা-নেত্রীর আনুগত্য করা যাবে না। আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে মানবরচিত কোনো আইন-বিধান মানা যাবে না। ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, আন্তর্জাতিক জীবনে, ব্যাংকে, আদালতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করতে হবে।

আবার, যেমনি ভাবে,

বর্তমানে ক্ষমাতাসীন বেশীরভাগ মানুষ নিজ নিজ জায়গায় ইলাহের আসনে বসে আছে-পরিবারে, সমাজে, অফিসে,রাজনৈতিক দলে, পার্লামেন্টে, সরকারে,

তেমনিভাবে ,

তৎকালীন আবু জাহেল, আবু লাহাব, আবু সুফিয়ানরাও ইলাহের আসনে বসে ছিল। তারা জানতো, এর বিরোধীতা না করলে তাদের ক্ষমতা হারাতে হবে কেননা কালেমা আল্লাহ ছাড়া সকলের আনুগত্য অস্বীকার করে। এই কারনে, সকল নবী রাসুল সহ যেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর দাওয়াত দিয়েছে, তাদের সর্বপ্রথম বিরোধিতা করেছিল সেখানকার তৎকালীন ক্ষমতাসীনরা যারা মুলত নিজেদেরকে ইলাহের আসনে বসিয়ে রেখেছিল । এই কারনে, এসবকিছু বুঝে-শুনেই তারা বিরোধিতা করেছিল। পবিত্র কুরআনে তাদের বক্তব্যকে সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নের আয়াতে বলা হয়েছে:

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

"তবে কি সে সকল ইলাহগুলোকে এক ইলাহতে কেন্দ্রীভূত করে ফেলল? এতো অত্যন্ত আজব কথা।" (সোয়াদ, ৩৮: ৫)

অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের মূল পার্থক্য হল—ইসলাম বলে এক আল্লাহরই আনুগত্য করতে হবে, অন্য ধর্ম বলে—আল্লাহর আনুগত্যও মানবো এবং অন্যদের কথাও মানবো। কিতাবুল ইমান (২য় সংস্করণ পৃষ্ঠা: ১১২ থেকে ১১৩) মুফতী মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন

ইলাহ অর্থ আল্লাহ নয়, আর এক আল্লাহতে বেশিরভাগ মানুষ বিশ্বাস তখনো করতো এবং এখনো করে।

আবার, আল্লাহ বলেন:

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ

"যদি তুমি তাদেরকে (মুশরিকদের) জিজ্ঞেস করো: কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চাঁদ-সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করছেন? তারা অবশ্যই বলবে: আল্লাহ!" (আনকাবুত ২৯:৬১)

আরো পাবেন এই নিম্নের আয়াতগুলোতে:

- Az-Zukhruf ৪৩:৮৭
- Az-Zumar ৩৯:৩৮

- Surah Luqman ৩১:২৫
- Surah Jumar ৩৯:৩৮

অমুসলিমরাও সর্বশক্তিমান এক আল্লাহতেই বিশ্বাস করে। তবে মুসলিমদের এক আল্লাহর বিশ্বাস এবং অমুসলিমদের এক আল্লাহর বিশ্বাস এক নয়, কারণ ইসলাম বলে এক আল্লাহরই আনুগত্য করতে হবে, অন্য ধর্ম বলে—আল্লাহর আনুগত্যও মানবো এবং অন্যদের কথাও মানবো।

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

"তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, কিন্তু (ইবাদাতে) আল্লাহর সাথে অন্যদের অংশীদার করে অনেককে।" (ইউসুফ ১২:১০৬)

আল্লাহকে বেশিরভাগ মানুষই বিশ্বাস করে। কিন্তু আল্লাহ একজন আছেন শুধুমাত্র এই বিশ্বাসের নাম ইমান নয়। ইমান হল—আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য মেনে কোন কাজ করা যাবে না, এই বিশ্বাস মজবুতভাবে ধারণ করা।

কেউ যদি কোনো ভালো কাজের কথা বলে, তখনও কি তার আনুগত্য করা যাবে না?

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না।" (আল-মানিদাহ ৫:২)

যে কোনো ভালো কাজে সহযোগিতা, এটা আল্লাহর নির্দেশ। তাই, আপনাকে চিন্তা করতে হবে, যে ভালো কাজ করতে বলেছে, আপনি তার আনুগত্য করতেছেন না, বরং আল্লাহ অনুমতি দিয়েছে বলেই তার কাজে সহযোগিতা করছেন।

আমরা রাসুলের দেখানো পথে আমাদের প্রতিদিনের কাজকর্ম কেন করি? কারণ আল্লাহ অনুমতি দিয়েছে বলেই করি, না হয় করতাম না। তাই রাসুলের দেখানো পথে চলা, এটাও আল্লাহর আনুগত্যেরই অংশ।

রব

"রব" শব্দটি মূলত যেকোনো দাতা বা প্রদানকারী অর্থে আরবদের মধ্যে ব্যবহৃত হতো। যে কেউ কিছু দান করে, সিদ্ধান্ত দেয়, অর্থ দেয়, খাবার দেয়, এমনকি লালন পালন করে—তাকে "রব" বলা হতো। লালন পালন করতে হলে তো কিছু দিতে হয়—যেমন: পানি, বাসস্থান, বস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদি। আরবরা এই কারণেই এসব ক্ষেত্রে "রব" শব্দটি ব্যবহার করত। তবে, যখন "আল-রব" শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তখন সেটা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ হচ্ছেন বিশ্বজগতের একমাত্র রব, এবং আল্লাহ ছাড়া কেউ এই দাবি করতে পারে না—পাগল ছাড়া।

আজকে আমরা "রব" শব্দের প্রকৃত অর্থ ভুলে যাওয়ার ফলে, আধুনিক যুগের "ফেরাউন"দের চিহ্নিত করতে পারছি না। আসুন দেখি এই ব্যাপারে আল-কুরআন কি বলে—

"وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا"

‘হে প্রভু! আমার পিতামাতার প্রতি দয়া করো, যেমন তারা আমাকে ছোট থাকতে (দয়া দিয়ে) লালনপালন করেছেন।’

(আল-কুরআন, আল-ইসরা ১৭:২৪)

এখানে বাবা-মা বুঝাতে "রব" শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে।

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায়, ইউসুফ নবী যখন জেলখানায় ছিলেন তিনি তখন বাদশাহ আজিজকে তার সংগীদের রব বলে সম্বোধন করেছেন -

"يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا"

‘হে আমার কারাসঙ্গীদ্বয়, তোমাদের একজন তার রবকে মদপান করাবে।’

(আল-কুরআন, ইউসুফ ১২:৪১)

আবার নিম্নের আয়াতে ইউসুফ নবী তার আশ্রয়দাতাকে "রব" হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা তখনকার আরবদের ব্যবহারিক অর্থে এসেছে।

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّيْٓ اَحْسَنَ مَثْوَايَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ

আর যে মহিলার ঘরে ইউসুফ ছিলেন, সেই (জুলেখা) তাকে কুপ্ররোচনায় প্রলুব্ধ করল। দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে বলল, "এসো!" কিন্তু ইউসুফ বললেন, "আল্লাহর আশ্রয় চাই! নিশ্চয় তিনি (তোমার স্বামী আজিজ) আমার রব; তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয়ই জালিমরা কখনো সফল হয় না।"

(আল-কুরআন, ইউসুফ ১২:২৩)

এখানে ইউসুফ নবী তার আশ্রয়দাতা আজিজকে "রব" হিসেবে উল্লেখ করছেন, যা তৎকালীন আরবদের দৈনন্দিন ব্যবহারের একটি উদাহরণ।

আবার, আল্লাহ নিজেই আজিজকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন জেলখানা থেকে মুক্তি পাওয়া ব্যক্তির "রব" হিসাবে—

وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ۫ فَاَنْسٰهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ

‘আর তাদের দু'জনের মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে সে ধারণা করেছিল, তাকে বলল, “তোমার রবের কাছে আমার কথা উল্লেখ করবে। কিন্তু শয়তান তাকে তার "রব"-এর কাছে ইউসুফের কথাটি উল্লেখ করার বিষয়টি ভুলিয়ে দেয়, ফলে ইউসুফ আরও কয়েক বছর জেলে অবস্থান করেন।”’

(আল-কুরআন, ইউসুফ ১২:৪২)

এই আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে তৎকালীন আরবরা শাসকদেরও "রব" বলে ডাকত।

এত কিছু বলার মূল কারণ হলো আজকের যুগের "ফিরাউন"দের চেনা। যেমন ফিরাউন নিজেকে শাসক অর্থে "রব" দাবি করেছিল। প্রথমে সে বলেছে—

"وَنَادٰي فِرْعَوْنُ فِيْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ"
'আর ফির'আউন তার কওমের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে বলল, "হে আমার কওম! মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়? আর এই নদীগুলো কি আমার নিয়ন্ত্রণে প্রবাহিত হচ্ছে না? তোমরা কি দেখছ না?"'
(আল-কুরআন, আয-যুখরুফ ৪৩:৫১)

প্রথমে, ফিরাউন নিজেকে মিশরের শাসক হিসেবে ঘোষণা করে। দ্বিতীয়ত, এখন যেমন টেকনোলজি ব্যবহার করে নদী ও পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হতো, ফিরাউনও তার সময়কার টেকনোলজির ক্ষমতা ব্যবহার করত।

বর্তমান সরকারগুলোর মতোই ফিরাউনও তার সময়কার পানি, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করত। বর্তমান শাসকরা যেমন যখন যেখানে চায় এইগুলো সরবরাহ করতে পারে, আবার বন্ধও করতে পারে।

এটা থেকে স্পষ্ট হয় যে মানুষ বিভিন্নজনকে "রব" বানায়।

কিন্তু যেখানে আল্লাহই একমাত্র রব, সেখানে তাঁর স্থানে অন্য কাউকে "রব" হিসেবে মর্যাদা দেওয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন—

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰـهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

যে বিষয়ে আল্লাহ নিজেকে রব দাবি করেছে, সেবিষয়ে তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের (ধর্মীয় আলেম) যাজক ও পাদ্রীদেরকে এবং মরিয়মের পুত্র (তাদের নবী ঈসা) মসীহকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।অথচ তাদেরকে একেবারেই কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নাই যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে। (কেননা), আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (বা আনুগত্য মেনে কাজ পাওয়ার যোগ্য কেও) নাই। আল্লাহ সকল অযোগ্যতা থেকে মুক্ত, তা সত্বেও তারা আল্লাহর সাথে অনেককে অংশীদার করে।
(আল-কুরআন, আত-তাওবাহ ৯:৩১)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অনেকে নিম্নের হাদিসটি উল্লেখ করেন—

তিরমিযীর বর্ণনা অনুযায়ী, দানবীর হাতেম তাই-এর পুত্র হযরত আদী ইবনে হাতেম নবী (সা.) এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তখন খ্রিস্টান ছিলেন এবং নবী (সা.)-কে কিছু প্রশ্ন করেন। এর মধ্যে একটি ছিল, কুরআনের এই আয়াতে উলামা ও দরবেশদেরকে রব বানানোর অর্থ কী। নবী (সা.) উত্তরে বলেন, "তারা যেগুলোকে হারাম বলত, তোমরা সেগুলোকে হারাম বলে মেনে নিতে এবং যেগুলোকে হালাল বলত, সেগুলোকে হালাল বলে মেনে নিতে। একথা কি সত্য নয়?" হযরত আদী বলেন, "হ্যাঁ, এটি ঠিক, আমরা এভাবেই করতাম।" তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "এটিই হলো তাদেরকে রব বানিয়ে নেওয়া।"

এ থেকে স্পষ্ট হয়, আল্লাহর নির্দেশনা বা কিতাবের সনদ ছাড়া যারা মানবজীবনের জন্য হালাল ও হারাম নির্ধারণ করে, তারা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী আল্লাহর সার্বভৌমত্বের মর্যাদায় বসে যায়। আর যারা তাদের এই ক্ষমতা মেনে নেয়, তারা কার্যত তাদেরকে আল্লাহর স্থলে তাদের "রব" বানিয়ে নেয়।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, ধর্মীয় পণ্ডিতরাও "রব" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কীভাবে তারা ইসা (আ.)-কে রব বানাল?

আমরা জানি, নবীরা আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া আল্লাহ্‌র নাম ব্যবহার করে কিছু করেননি। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর মানুষ তাদের নামে মিথ্যা গল্প বা জাল হাদিস তৈরি করেছে, যা তারা কখনো বলেননি বা করেননি।

যেমন: ইসা (আ.) কখনো নিজেকে আল্লাহ দাবি করেননি। খ্রিস্টানরা এখন যেসব ইবাদত করে, তার অনেকগুলোই ইসা (আ.) নিজে করেননি বা করতে বলেননি। কিন্তু তার অনুসারীরা তার নামে জাল ঘটনা বা প্রমাণ দাঁড় করিয়ে তাকে "রব" হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। অথচ ইঞ্জিলে এর কোনো প্রমাণ নেই।

আরো সহজ করে বলি: ধরুন, আপনি একটি কথা বলেননি, কিন্তু কেউ সেটা আপনার নামে চালিয়ে দিয়েছে। একইভাবে, নবী (সা.) কোনো কিছু বলেননি বা করেননি, কিন্তু তার নামে মিথ্যা দাবি করা হচ্ছে। আপনি যদি এই মিথ্যাকে গ্রহণ করেন, তাহলে এই আয়াত আপনার জন্যও প্রযোজ্য, কেননা আপনি নবী (সা.)-কে মিথ্যা "রব" বানিয়ে নিচ্ছেন।

সিদ্ধান্ত আসবে কোরআন থেকে, কিন্তু বর্তমানে কিছু সিদ্ধান্ত আসে আলেমদের ফতোয়া, পার্লামেন্ট, অথবা জাল হাদিসের ভিত্তিতে। এটি আমাদেরকে সতর্ক হতে শেখায়।

আল্লাহ বলেন—
"اِنِ الۡحُکۡمُ اِلَّا لِلّٰہِ"
'হুকুম (সিদ্ধান্ত) একমাত্র আল্লাহরই।'
(আল-কুরআন, ইউসুফ ১২:৬৭)

অতএব, যেখানে আল্লাহর হুকুম বিদ্যমান, সেখানে আপনি যদি অন্য কারো হুকুম মানেন, তাহলে আল্লাহর পরিবর্তে আপনি তাকে "রব" হিসেবে গ্রহণ করলেন।

তাহলে, "ইলাহ" এবং "রব" এর মধ্যে পার্থক্য কী?

"রব" এবং "ইলাহ" শব্দের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে:

"রব" শব্দটি দাতা বা প্রদানকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমনঃ আদেশ দাতা, সিদ্ধান্ত দাতা, খাবার দাতা ইত্যাদি। ধরুন দুইজন ব্যক্তি, একজনের নাম- রফিক, আরেকজনের নাম -সায়েম। যখন রফিক সায়েমকে কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক কোন অন্যায় কাজের নির্দেশ দেয়, তখন রফিক রবের কাজ করল। কিন্তু এই কাজটির ব্যপারে সায়েম আনুগত্য করবে কি করবে না এই ব্যপার সায়েম স্বাধীন। সায়েম যদি আনুগত্য না মানে,তাহলে রফিক তার রব না। আবার ধরেন, সায়েম মুখে মুখে মন থেকে আনুগত্য মেনে নিল, কিন্তু কাজে প্রকাশ

করল না সেখেএেও সায়েম রফিককে রবের মর্যাদা দিল, কিন্তু যেহেতু কাজে প্রকাশ করে নাই তাই রফিককে সায়েম ইলাহের মর্যাদা দিল না।

আর **"ইলাহ"** হলেন গ্রহীতা অথবা যার আনুগত্য করা হয় , তাকে ইলাহ বলে। আর, যখন রফিক সায়েমের কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক কোন অন্যায় আদেশ মেনে নিয়ে তা কাজে বাস্তবায়ন করল, তখন বলা হয়, রফিক সায়েমের আনুগত্য করল অর্থাৎ তাকে ইলাহ হিসেবে মেনে নিল এবং সায়েম আনুগত্য গ্রহণ করল। যেহেতু, সায়েম আনুগত্য গ্রহিতা, সে অর্থে সে ইলাহ।

অনেকে মনে করে জড় বস্তুও ইলাহ হতে পারে,কিন্তু সে কিভাবে আনুগত্য গ্রহণ করবে? আর যে আনুগত্য নিতে পারে না, সে কখনো ইলাহ হতে পারে না । এই কারনে আল্লাহ কুরআনে মানুষ যে নিজেকে ইলাহ বানিয়েছে সে সম্পর্কে বললেও জড়বস্তুর ক্ষেত্রে সেটি বিদ্রুপাত্মক অর্থে বলেছে। তার মানে দাঁড়ায়, যে আনুগত্য নিতে পারে না তাকেও মানুষ ইলাহ মনে করে।

যেমন, আল্লাহ আপনাকে রোজা রাখতে বলেছেন, কিন্তু আপনি রোজা রাখলেন না। এখানে আল্লাহ রব হিসেবে আপনাকে আদেশ দিয়েছেন, কিন্তু আপনি তাঁর আদেশ মানেননি। ফলে, আদেশ দাতা রব আল্লাহর আনুগত্য গ্রহণ করা হয়নি।

এখন ধরুন, আপনার পিতা আপনাকে বলেন, "অমুকের জমি অন্যায়ভাবে দখল করে নাও।" আপনি যদি তার আদেশ মেনে কাজ করেন, তাহলে আদেশ দেওয়ার মাধ্যমে আপনার পিতা "রব"-এর ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু যতক্ষণ আপনি তার আদেশ পালন না করেন, তিনি আপনার "ইলাহ" হবেন না। যখন আপনি তার কথামতো কাজ করবেন, তখন তিনি আপনার "ইলাহ" হয়ে যাবেন, কারণ আপনি তাকে আনুগত্য দিয়েছেন এবং তিনি সেই আনুগত্য গ্রহণ করেছেন।

দুনিয়াতে অনেকেই—বাবা-মা, ভাই-বোন, শাসক, বন্ধু, বস—রবের আসনে বসে আদেশ দিতে পারে। কিন্তু মুমিনরা কারোরই ইলাহ হিসেবে স্বীকৃতি দেবে না, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। যদি তাদের আদেশ আল্লাহর আদেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, সেটি আল্লাহর আদেশই গণ্য হবে।

এ কারণেই আল্লাহ বলেননি—

"লা রব্বা ইল্লাল্লাহ"- আল্লাহ ছাড়া কোন রব মানি না

কেননা অনেকেই আদেশদাতা অর্থে "রব" হিসেবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। কিন্তু,আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য মেনে কাজ করা যাবে না।

আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে আমরা রবের আসনে বসাই:

১. পার্লামেন্ট সদস্য:

আইন প্রণয়নকারী পার্লামেন্ট সদস্যরা দেশের বিভিন্ন আইন ও বিধি প্রণয়ন করেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি পার্লামেন্ট এমন একটি আইন পাস করে যা ইসলামের নীতির বিপরীত, তখন যারা সেই আইন মেনে চলে, তারা আদর্শভাবে আল্লাহর আদেশের পরিবর্তে পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তকে উচ্চমার্যাদা দেয়।

২. নেতা বা রাজনৈতিক নেতা:

রাজনৈতিক নেতারা দেশের নীতিমালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উদাহরণস্বরূপ, একজন রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী যদি কোনো সিদ্ধান্ত নেন যা ইসলামের বিধির বিরুদ্ধে, তার অনুসারীরা সেই সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দেয়।

৩. এলাকার চেয়ারম্যান ও মেম্বার:

স্থানীয় প্রশাসনের চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা এলাকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন চেয়ারম্যান স্থানীয়ভাবে কিছু অযাচিত আদেশ দেন, তার সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে কেউ কেউ তাকে "রব" হিসেবে মেনে নেয়।

৪. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO) বা ব্যবসার মালিক:

একটি কোম্পানির CEO বা ব্যবসার মালিক সিদ্ধান্ত নেন যে কর্মচারীরা মেনে চলতে বাধ্য। উদাহরণস্বরূপ, একটি ব্যবসার মালিক যদি এমন কিছু আদেশ দেন যা ইসলামের বিধির বিরুদ্ধে, কর্মচারীরা সেই আদেশ মেনে নিয়ে তাকে "রব" হিসেবে মেনে নেয়।

৫. শিক্ষক:

শিক্ষকেরা শিক্ষার ক্ষেত্রের নিয়ম এবং নীতি নির্ধারণ করেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষক ধর্মীয় বিষয়ে এমন সিদ্ধান্ত দেন যা ইসলামের বিধির বিরুদ্ধে, ছাত্ররা সেই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে তাকে "রব" হিসেবে গণ্য করতে পারে।

৬. নবী এবং ধর্মীয় আলেম:

নবীরা কখনও নিজেদেরকে "রব" হিসাবে দাবি করেননি বা তাদের অনুসারীদের এমন নির্দেশ দেননি। কিন্তু কিছু মানুষের মিথ্যা প্রচারণা এবং ভুল বুঝাবুঝির কারণে, তারা নিজেদেরকে নবীর নাম ব্যবহার করে ধর্মীয় সিদ্ধান্ত ও আদেশের উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে।
খ্রিস্টানদের কিছু মতবাদ অনুযায়ী, ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর অংশ বা প্রভু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যদিও ঈসা (আঃ) কখনও নিজেকে রব দাবী করেননি, কিছু মানুষ মিথ্যা হাদিস এবং গুজবের মাধ্যমে তাকে "রব" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কুরআন অনুযায়ী, ঈসা (আঃ) নিজেকে রব দাবি করেননি।

আবার,

কিছু ধর্মীয় পণ্ডিতরা ধর্মীয় বিধি-নিষেধ নির্ধারণে এমন মতবাদ প্রকাশ করেছেন যা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো আলেম এমন কিছু সিদ্ধান্ত দেন যা কুরআনের নির্দেশনার বিপরীতে হয় এবং সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া হয়, তাহলে তা "রব" বানানোর মতো হতে পারে। কুরআন বলে:

اِتَّخَذُوۡۤا اَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَانَهُمۡ اَرۡبَابًا مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَالۡمَسِيۡحَ ابۡنَ مَرۡيَمَ ۚ وَمَاۤ اُمِرُوۡۤا اِلَّا لِيَعۡبُدُوۡۤا اِلٰـهًا وَّاحِدًا ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبۡحٰنَهٗ عَمَّا يُشۡرِكُوۡنَ

যে বিষয়ে আল্লাহ নিজেকে রব দাবি করেছে, সেবিষয়ে তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের (ধর্মীয় আলেম) যাজক ও পাদ্রীদেরকে এবং মরিয়মের পুত্র (তাদের নবী ঈসা) মসীহকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।অথচ তাদেরকে একেবারেই কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নাই যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে। (কেননা), আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (

বা আনুগত্য মেনে কাজ পাওয়ার যোগ্য কেও) নাই। আল্লাহ সকল অযোগ্যতা থেকে মুক্ত, তা সত্বেও তারা আল্লাহর সাথে অনেককে অংশীদার করে।
(আল-কুরআন, আত-তাওবাহ ৯:৩১)

নবী বা আলেমদের আদেশ এবং নির্দেশনার ক্ষেত্রে কুরআনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কিছু মিথ্যা প্রচারণা বা ভুল ব্যাখ্যা তাদেরকে "রব" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তবে, মুমিনদের জন্য কুরআনের নির্দেশনা একমাত্র সত্যিকারের পথনির্দেশক এবং আল্লাহই একমাত্র আসল "রব" যিনি সঠিক নির্দেশনা প্রদান করেন। অতএব, কোনো প্রকার মিথ্যা বা ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে আল্লাহর আদেশের পরিবর্তে অন্য কারো আদেশ মেনে নেওয়া উচিত নয়।

আল্লাহ বলেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"নিশ্চয়ই আমরা কুরআন নাজিল করেছি, এবং আমরাই এর সংরক্ষক।"

— (সূরা আল-হিজর, আয়াত ৯)

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি কুরআনের সংরক্ষণ দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেছেন, এবং কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন অপরিবর্তিত থাকবে।

কিন্তু,

আল্লাহ সরাসরি হাদিস সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এমন কোনো আয়াত কুরআনে উল্লেখ নেই। তবে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ ও তাঁর কথামালার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ বলেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا
অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (এর প্র্যাকটিক্যাল জীবন যেমন যুদ্ধ, রাজনীতি, সমাজনীতি সহ সৃপূর্ন জীবনের) মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।

— (সূরা আল-আহযাব, আয়াত ২১)

এছাড়া, হাদিস সংরক্ষণ ও তা প্রামাণিকভাবে সংরক্ষণ ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই মুসলিম উম্মাহর সাহাবী ও তাবেঈনের মাধ্যমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে হয়ে এসেছে। আল্লাহর ইচ্ছায় এবং মুসলিম উম্মাহর প্রচেষ্টায় হাদিস সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই, এবং সংরক্ষণ একটি সুসংগঠিত প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে।

তা সত্ত্বেও, কিছু জাল হাদিস সমাজে বিদ্যমান।

আর, কালেমার মাধ্যমে যখন আপনি ঘোষনা দিচ্ছেন, আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য আপনি মানেন না, তাই বলা যায়, কালেমা হাদিসকে কুরআনের কষ্টিপাথরে যাচাইয়ে বাধ্য করে। নিঃসন্দেহে রাসূলের হাদিস কুরানের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না,কিন্তু জাল হাদিস যেটি কুরানের সাথে সাংঘর্ষিক তা বর্জনীয়।

তাগুত

তগা অর্থ - অবাধ্যতার শেষ সীমাও অতিক্রম করা। যে ব্যক্তি এই এই শেষ সীমা অতিক্রম করে, তাকে **তাগুত** বলা হয়।

ইমান আনার পূর্বশর্ত হল, তাগুতকে কুফর করা বা অপছন্দ দিয়ে আবৃত করা। আল্লাহ বলেন:

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا
"যারা তাগুতকে (অপছন্দ দিয়ে) কুফর করে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করে, তারা দৃঢ়তম বন্ধন আঁকড়ে ধরেছে, যা কখনো ছিঁড়বে না।"
[সূরা আল-বাকারা ২:২৫৬]

সকল নবীর দাওয়াত ছিল একটাই: শুধুমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে এবং অবশ্যই তাগুত থেকে দূরে থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ
"আমি তো প্রত্যেক জাতির কাছে এই দাওয়াত নিয়ে একজন রসূল পাঠিয়েছি, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে দূরে থাক।'"
[সূরা আন-নাহল ১৬:৩৬]

এখন, এটি স্পষ্ট যে তাগুতকে চেনা জরুরি।

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ও অভিধান প্রণেতা হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (মৃত্যু ৩৯৫ হিজরী) তার বিখ্যাত গ্রন্থ "মাকায়িস আল-লুগাহ" তে এই শব্দের সংজ্ঞাতে লিখেনঃ যারা অবাধ্যতার সীমা অতিক্রম করে, তাদেরকে তাগুত বলা হয়। এমনকি অত্যাচারেরও একটা সীমা থাকে; যারা সেই সীমাও অতিক্রম করে, তাদেরকেও তাগুত হিসেবে গণ্য করা হয়। আরব ভাষার অভিধানবিদ আল-খলিল রহিমাহুল্লাহ বলেন, তাগুত হলেন নিষ্ঠুর এবং জালেম শাসক বা নেতা।

যখন বন্যার পানি এতটাই বেড়ে যায় যে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন বলা হয় পানি তগা করছে। আল্লাহ কুরআনে বলেন:

اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ

"(নূহের প্লাবনে) যখন পানি তগা করেছিল"

[সূরা আল-হাক্কাহ ৬৯:১১]

এখানে আল্লাহ বোঝাতে চেয়েছেন যে, পানি তার বিপদসীমা অতিক্রম করে তা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল।

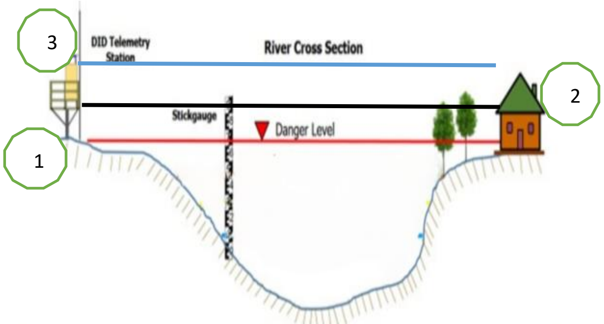

নদীর পানির লেবেলকে কয়েক লেবেলে ভাগ করা থাকে যেমন: ১,২,৩,৪...... যখন লেবেল এক এর সমান বা তার নীচে থাকে তখন বলি পানির লেবেল ঠিক আছে। কিন্তু লেবেল ১ বা স্বাভাবিক লেভেলে অতিক্রম করলে বলি, পানি তার লেবেল অতিক্রম করে পেলেছে। এখন পানি যত বাড়বে, পানি তত বেশী সীমারেখা অতিক্রম করবে। এইভাবে পানির লেবেল যত বেশী অতিক্রম করবে, ক্ষয় ক্ষতির পরিমান তত বাড়তে থাকবে, এবং লেবেল দেখে বন্যার বা প্রকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা আমরা পরিমাপ করি।

তেমনিভাবে, মানুষের সীমারেখা আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, এই সীমারেখা কোন মানুষের অতিক্রম করা নিষিদ্ধ।

কিন্তু, কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহর আনুগত্যের সীমারেখা মাড়িয়ে তাদের নিষ্ঠুরতার লেবেল ১ নাম্বার বা আল্লাহর দেয়া স্বাভাবিক সীমা ছাড়িয়ে অন্য ২,৩,৪,৫...লেভেলও ছাড়িয়ে যায়, যে যত বেশী লেবেল ক্রস করে সে তত বড় লেবেলের তাগুত।

যেমন ধরুন, আপনি অন্যায় ভাবে একজনকে হত্যা করলেন। এরপর অপরাধ বোধ থেকে এই কাজ আর করলেন না। কিন্তু, যেহেতু আপনি মানুষ হত্যা করেছেন, আপনি আল্লাহর দেয়া নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করলেন। কিন্তু আপনি যেহেতু আর এই অন্যায় করেন নাই, তাই আপনি তাগুত না।

কিন্তু, যদি আপনি পুনরায় আবার হত্যা করলেন, আবার করলেন, শত শত মানুষ হত্যা করলেন। আপনি যত বেশী লেবেল ক্রস করবেন তত বড় লেভেলের তাগুত। হিটলার আর বাংলাদেশের শত শত ছাত্র হত্যাকারী সাবেক প্রধানমন্ত্রী দুই জনই তাগুত, কিন্তু অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী লেবেল আলাদা।

তাগুত চিহ্নিতকরণ এবং সমাজে প্রধান প্রধান তাগুত কারা:

আনুগত্যের সর্বশেষ সীমারেখারও সীমা কারা লঙ্ঘন করে, আমরা কুরআন থেকে আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পারি। কুরআনে আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন কাদেরকে তাগুত বলা হয় এবং কীভাবে তারা আল্লাহর দেওয়া সীমা অতিক্রম করে।

১. নিজস্ব আইন তৈরি ও বিচার ফয়সালা:

যারা আল্লাহর আইনের বাইরে গিয়ে নিজস্ব নিয়মকানুন তৈরি করে এবং মানুষকে সেই নিয়ম অনুযায়ী চালায়, তারা তাগুতের ভূমিকায় কাজ করে।

উদাহরণ: পার্লামেন্ট, সরকার প্রধান, সমাজপতি, ধর্মীয় নেতা, অফিসের বস বা পরিবারের প্রধান।

আল-কুরআন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ...

"তুমি কি দেখনি যারা দাবি করে যে তারা তোমার কাছে এবং পূর্ববর্তী কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছে, কিন্তু তারা তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায়?"

[সূরা আন-নিসা ৪:৬০]

২. মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে অন্যায় পথে নেওয়া:

তাগুত মানুষের মনমতো পদ্ধতি তৈরি করে, যাতে তারা আল্লাহর নিয়মের বাইরে চলে যায়।

উদাহরণ: তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, সংবাদকর্মী, প্রোপাগান্ডা টিম এবং দলের নেতারা।

আল-কুরআন:

اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ...

"আল্লাহ ঈমানদারদের অভিভাবক, তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। আর কাফিরদের অভিভাবক হল তাগুত, তারা তাদের আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়।"

[সূরা আল-বাকারা ২:২৫৭]

৩. আল্লাহর পথে চলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ:

যারা কুরআন ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাগুত তাদের বিরোধিতা করে এবং ধ্বংসের চেষ্টা চালায়।

উদাহরণ: সরকার ও সমাজের কিছু গোষ্ঠী আল্লাহর রাস্তায় চলা লোকদের ওপর আক্রমণ করে।

আল-কুরআন:

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ...

"যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, আর যারা কুফর করেছে তারা তাগুতের পথে লড়াই করে।"

[সূরা আন-নিসা ৪:৭৬]

৪. আদর্শ ও মতবাদকে আল্লাহর আনুগত্যের উপরে স্থান দেওয়া:

যে কোনো মতবাদ বা আইডিওলজি, যা আল্লাহর আনুগত্যকে অস্বীকার করে বা অপছন্দ করে, তা তাগুত।

উদাহরণ: বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মতবাদের জনকদের অনুসরণ করা।

কিছু প্রধান তাগুতের তৈরি আদর্শ:

- **রাজনৈতিক মতবাদ:**
  - লিবারেলিজম: জন লক
  - সোশ্যালিজম: কার্ল মার্ক্স
  - ফ্যাসিজম: বেনিটো মুসোলিনি

- **সামাজিক মতবাদ:**
  - ফেমিনিজম: মেরি ওলস্টোনক্রাফট
  - এনভায়রনমেন্টালিজম: হেনরি ডেভিড থোরো
- **অর্থনৈতিক মতবাদ:**
  - ক্যাপিটালিজম: অ্যাডাম স্মিথ
  - মার্ক্সিজম: কার্ল মার্ক্স
- **ধর্মীয় মতবাদ:**
  - সেক্যুলারিজম: জর্জ জ্যাকব হলিওক
  - থিওক্রেসি: বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ থেকে উদ্ভূত, আল্লাহর আনুগত্যের পরিপন্থী।
- **সাংস্কৃতিক মতবাদ:**
  - পোস্টমডার্নিজম: জ্যাঁ-ফ্রাঁসোয়া লিয়োতার্দ
  - কালচারাল রিলেটিভিজম: ফ্রাঞ্জ বোয়াস

আল-কুরআন:
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ...
"তুমি কি দেখনি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছে? তারা জিবত ও তাগুতের প্রতি ঈমান আনে এবং কাফিরদেরকে বলে যে, তারা মুমিনদের তুলনায় অধিক সঠিক পথে রয়েছে।"
[সূরা আন-নিসা ৪:৫১]

জিবত الجبت অর্থ: মূর্তি, প্রতিমা, যাদুকর, ভেলকিবাজ, যাদু ইত্যাদি।

এখানে একটি বিষয় বুঝতে হবে—সকল তাগুত ইলাহ হতে পারে, কিন্তু সকল ইলাহ তাগুত নয়। ইলাহ বলতে বোঝায় যার প্রতি মানুষের খুশিমনে আনুগত্য থাকে এবং মানুষ সে আনুগত্যকে কাজে রুপ দেয়। কিন্তু তাগুত তার চেয়ে ভিন্ন; তারা অবাধ্যতার এমন সীমা অতিক্রম করে যে, মানুষকে জোরপূর্বক অন্যায় পথে পরিচালিত করে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো নেতা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যার আদেশ দেয় এবং কেও তা কার্যকর করে, তাহলে সেই নেতা তাগুত হয়ে যায়। আবার যে তাগুতের আনুগত্য করেছে সে তাগুত হয়ে যায় আনুগত্যকারির ইলাহ।

ফেরাউন শাসক হিসাবে ছিল তাগুত।

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى

"ফেরাউনের কাছে যাও, সে তগা করেছে।"

সুরা আন-নাযিয়াত (৭৯:১৭)

আর যে তগা বা অবাধ্যতার সীমা অতিক্রম করে তাকে তাগুত বলে।

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন ফেরাউনের কাছে যাওয়ার জন্য, কারণ ফেরাউন অহংকারী হয়ে সীমালঙ্ঘন করেছে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।

এমন উদাহরণ সমাজে প্রচুর দেখা যায়—সরকার যখন নিরাপরাধ মানুষদের গুলি করে হত্যার নির্দেশ দেয় এবং প্রশাসন তা মেনে নেয়, তখন সরকার তাগুত হিসাবে পরিগণিত হয়। এই ধরনের রাজনৈতিক নেতা, কোম্পানির বস, সমাজপতিদের আমরা তাগুত হিসেবে চিনি, কারণ তাদের একটি অনুগত অনুসারী দল থাকে যারা তাদের আদেশ মেনে চলে এবং কাজ করে।

আল-কুরআন:

وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ؕ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ

"যারা তাগুতের ইবাদত বা আনুগত্য মেনে কাজ করেছে, তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং সত্যপথ থেকে অনেক দূরে।"

[সূরা আল-মায়িদা ৫:৬০]

তবে যারা তাগুতের আনুগত্য থেকে বিরত থাকে এবং আল্লাহর প্রতি অনুগত হয়, তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন:

আল-কুরআন:

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَي اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰي ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ

"যারা তাগুতের আনুগত্য করে না এবং আল্লাহর অভিমুখী হয়, তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। অতএব, আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দাও।"

[সূরা আয-যুমার ৩৯:১৭]

এই আয়াতগুলো আমাদের শেখায় যে, যারা তাগুতের অনুগত থাকে তারা মর্যাদাহীন এবং পথভ্রষ্ট, আর যারা তাগুতের থেকে দূরে থাকে তাদের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি।

ইমান ও মুমিন

- ইমান: খুশী মনে কোন কিছু মেনে নিয়ে সে অনুসারে কাজ করবেন, মনের এই দৃঢ় বিশ্বাসকে ঈমান বলে। আর ইসলামী পরিভাষায় শুধুমাত্র খুশী মানে, এক আল্লাহর আনুগত্য মেনে কাজ করতে হবে এই দৃঢ় বিশ্বাসকে ঈমান

বলে। এজন্য আপনার ঈমান আপনাকে প্রতি কাজে কুরআনের কাছে যেতে বাধ্য করবে যে, আপনি যে কাজটি করতে চাচ্ছেন সেটি কুরআনে অনুমোদন আছে কিনা।

- মুমিন: যে ইমান আনে তাকে মুমিন বলে। আর ইসলামী পরিভাষায়, যারা আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য করা যাবে না এই বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী তাদেরকে মুমিন বলে। অর্থাৎ যারা কালেমায় বিশ্বাসী তারাই মুমিন।

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ও অভিধান প্রণেতা হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (মৃত্যু ৩৯৫ হিজরী) তার বিখ্যাত গ্রন্থ "মাকায়িস আল-লুগাহ" তে এই শব্দের সংজ্ঞাতে লিখেনঃ হামজা, মীম ও নুন এই ধাতুটির মূল অর্থ দুটি: প্রথম অর্থ—বিশ্বস্ততা, যা খেয়ানতের বিপরীত; এবং দ্বিতীয় অর্থ—বিশ্বাস করা বা কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করা। আমরা দেখছি যে, অর্থ দুটি খুবই নিকটবর্তী ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

তিনি উভয় অর্থে ঈমান শব্দের অর্থ আলোচনা করে উল্লেখ করেন যে, প্রথম অর্থে ঈমান অর্থ নিরাপত্তা প্রদান করা বা আমানতদার বলে মনে করা। দ্বিতীয় অর্থে ঈমান অর্থ বিশ্বাস করা, বিশ্বস্ততায় আস্থা স্থাপন করা।

বিশ্বাস বা ধর্মবিশ্বাস অর্থে কোরআন ও হাদিসে সর্বদা "ঈমান" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ক্রিয়ার ক্ষেত্রে "বিশ্বাস করল" অর্থে 'আমানা', 'আমানু' ইত্যাদি ক্রিয়াপদ, এবং "বিশ্বাস করো" অর্থে 'তু'মিনু', 'নু'মিনু' ইত্যাদি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্বাসী অর্থে 'মুমিন', 'মুমিনুন' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর বিশ্বাস অর্থে "ঈমান" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

সংক্ষেপে বলতে পারি, ঈমান হচ্ছে এমন বিশ্বাস, যে বিশ্বাসটাতে সর্বোচ্চ প্রোটেকশন দেওয়া থাকে, যার ভেতর অন্য বিশ্বাস ঢুকতে পারে না।
যেমন: আমরা বলি, লোকটা ঈমানদার, লোকটাকে টাকা ধার দেওয়া যায়।
এর মানে, আমানত রক্ষা করতে হবে—এই বিশ্বাসের জায়গায়, টাকা মেরে দেওয়ার চিন্তা তার মাথায় স্থান পায় না।

ইসলামী পরিভাষায় ঈমান কী?
আল্লাহ কুরআনে বলেন:
مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ
(হে রাসূল) তুমি জানতে না কিতাব কী এবং ঈমান কী?
[Al Quran, Ash-Shura 42:52]

আল্লাহ রাসুল (সঃ) বলছেন, তুমি জানতে না ঈমান কী? ঈমান বোঝার গুরুত্ব বুঝুন।
ইসলামে আল্লাহর প্রতি ঈমান হল, কালেমাতে বিশ্বাস করা।

আব্দুল কাইস গোত্রের প্রতিনিধিদের বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রা:) বলেন,
রাসুলুল্লাহ (স:) তাদেরকে একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমানের নির্দেশ প্রদান করেন এবং বলেন, তোমরা কি জানো যে, একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান কী? তারা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই অধিক জ্ঞাত আছেন। তিনি বলেন (একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান এই যে), তুমি সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ (ইবাদতযোগ্য) নেই এবং মুহাম্মদ (স:) তাঁর রাসূল।
[বুখারী, আস-সহীহ ১/২৯, ৪৫, ৪/১৫৮৮, ৬/২৬৫২, ২৭৪৭; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৪৭]

কোরআন ও হাদিস শরীফে সর্বদা বিশ্বাস ও ধর্ম বিশ্বাসকে ঈমান নামেই অভিহিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন -

ঈমান হচ্ছে (মুখের) স্বীকৃতি ও (অন্তরের) সত্যায়ন। বিশ্বাসকৃত বিষয়াদির দিক থেকে (যে যে বিষয়ে বিশ্বাস করা হয়েছে তাতে) আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের ঈমান বাড়ে না এবং কমে না, কিন্তু কাজে বাস্তবায়ন করার দৃঢ়তা, গভীরতা ও সত্যায়নের দিক থেকে ঈমান বাড়ে। তাই বলা যায়, ঈমান ও তাওহীদের ক্ষেত্রে মুমিনগণ সকলেই সমান। কিন্তু বিশ্বাস কাজে বাস্তবায়নের বেলায় সবাই সমান না।

যেহেতু আমার আর আপনার কলেমার বিশ্বাস এক যে - আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য মেনে কাজ করা যাবে না। তাই বিশ্বাসের দিক বিবেচনা করলে দুইজনের বিশ্বাসই সমান।

কিন্তু এই বিশ্বাসের মধ্যে যদি অন্য কারোও আনুগত্য করতে হয়, এই বিশ্বাস জাগে, তাহলে আপনার বিশ্বাসটা ১০০% পিওর থাকলো না, ভেজাল ঢুকলো।

এখন, কালেমার এই সাক্ষ্য কি না বুঝে দিলে হবে –

আল্লাহ বলেন-

مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
যারা জেনে-শুনে সত্য সাক্ষ্য দেয়।
Az-Zukhruf 43:86

"সাক্ষ্য প্রদান করা" বলতে এখানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর প্রতি সাক্ষ্য প্রদান করা বোঝানো হয়েছে। আর "জেনে শুনে" বলতে বোঝানো হয়েছে যে, তারা মুখে যে সাক্ষ্য প্রদান করেছে তাদের মনেও সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে। তাই কেউ যদি কালেমার মর্মার্থ না বুঝেই শুধু মুখে উচ্চারণ করে তাহলে এ কালিমা সত্যিকার অর্থে তার কোন উপকারে আসবে না। কেননা এই কালিমা যে অর্থ বহন করেছে, সে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি, নিছক একটি বাক্য উচ্চারণ করেছে মাত্র।

আর যারা এই কালিমায় বিশ্বাস করেছে যে - আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য মেনে কাজ করবে না, তাদেরকে মুমিন বলে।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি।
Al-Hujurat 49:15

রাসূলের প্রতি বিশ্বাসটা কেমন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا
অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (এর প্র্যাকটিক্যাল জীবন যেমন যুদ্ধ, রাজনীতি, সমাজনীতি সহ সৃপূর্ন জীবনের) মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।
Al-Ahzab 33

রাসুলের কাছে আল্লাহ যে কোরআন/কিতাব নাজিল করেছে তা বিশ্বাস এবং রাসূল আল্লাহর বাণী সমূহ প্র্যাকটিক্যালি (জীবনের সকল ক্ষেত্রে দৈনিন্দিন কাজে কিভাবে এপ্লাই করছেন, আমাদেরকেও সেভাবে কোরআনকে প্র্যাকটিক্যালি এপ্লাই করতে হবে।

যেমন: রাসুলের কিছু বিষয় ছিল কৌশলগত, কিছু বিষয় ছিল সব সময় এক।

যেমন: যুদ্ধগুলোতে তিনি এমন কৌশল অবলম্বন করার চেষ্টা করতেন, যাতে শত্রু বাহিনীর সমস্ত শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে শূন্য হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বদরের যুদ্ধে রাসূল (স:) আগে ময়দান দখল করে পানির ফোয়ারা সব নষ্ট করে দিলেন, ফলে কোরাইশরা যখন বদর প্রান্তের, পানি না পেয়ে, তখন তারা পিপাসার্ত ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল।

আবার খন্দকের যুদ্ধে খাল খনন করলেন, যাতে শত্রুরা মদিনাতে প্রবেশ করতে না পারে। এখানেও কৌশল এক, শত্রুর শক্তি জিরো করে দেওয়া, কিন্তু এক্সিকিউশন এর ধরন ভিন্ন।

আর নামাজ পড়ার, রোজা রাখা এগুলো সাধারন কর্মগত ইবাদত, রাসুল (স:) যেভাবে প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দিয়েছেন আমরা সেভাবেই করব।

সর্বশেষ বলা যায়,

স্কুলের পরীক্ষায় পাশ ফেলের শর্ত হল স্কুলে ভর্তি হওয়া। যে স্কুলে ভর্তি হয়নি, তার ক্লাস কি, পাশ কি আর ফেল কি।

ঠিক তেমনিভাবে, ঈমান আনার শর্ত হল- জেনে বুঝে কালেমার ঘোষণার প্রদান।কিন্তু, যেখানে আপনি জানেন না - আপনি কি সাক্ষ্য দিয়ে ঈমান এনেছেন- সেখানে আপনার নামাজ, রোজা, সহ যাবতীয় ইবাদত বৃথা প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই না।

তাফহীমুল কুরআনে আবুল আলা মওদুদী (র:) সুরা: আয-যুখরুফ, আয়াত নং: ৪৬ এর ব্যাখ্যায় বলেন-

সাক্ষ্যের জন্য জ্ঞান থাকা শর্ত। সাক্ষী যে ঘটনার সাক্ষ্য দান করছে তার যদি সে সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে তাহলে তার সাক্ষ্য অর্থহীন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটি ফায়সালা থেকেও এ বিষয়টি জানা যায়। তিনি একজন সাক্ষীকে বলেছিলেন: اذا رأيت مثل الشمس فاشهد والا فدع (احكام القران للجصاص)

“যদি তুমি নিজ চোখে ঘটনা এমনভাবে দেখে থাকো যেমন সূর্যকে দেখছো তা হলে সাক্ষ্য দাও। তা না হলে দিও না।”

আল্লাহ বলেন-

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

তিনি (আল্লাহ, শুধুমাত্র যার কাছে) সুপারিশের এখতিয়ার, তাকে যেখানে ডাকা দরকার সেখানে যারা অন্যদের ডাকে তাদের কোন সার্বভৌম ক্ষমতা নাই, (সার্বভৌম ক্ষমতা) হল আল্লাহর যার ব্যাপারে মানুষ জেনে বুঝে (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর) সত্য সাক্ষ্য দেওয়া হয়।

[সুরা-৪৩: আয-যুখরুফ, আয়াত নং: 86]

এখন আমরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করি, আমরা যে কালেমার সাক্ষ্য দিয়ে ইমান এনেছি, তা কি আমরা বুঝি? নাকি ইবাদতের নামে কিছু বৃথা প্রচেষ্টা চালাচ্ছি?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেও যদি শুধুমাত্র ইমান আনে তাহলে কি সে জান্নাতে যাবে?

দেখি কুরআন কি বলে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ
"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যথাযথ ভয়। আর তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মারা যেও না।"
(আল-ইমরান ৩:১০২)

আল্লাহ এই আয়াতে মুমিনদেরকে মুসলিম হতে বলেছে। এই জন্য মুমিন আর মুসলিম শব্দের পার্থক্য বুঝা দরকার।

আল্লাহ আরও বলেন-

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে।

Al-Baqarah 2:82

এই সম্পর্কিত আরো আয়াত আছে-

Surah An nisa 4:57, Surah Al maidah 5:9, Surah Al Kahf 18:30-31

এই আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট, জান্নাতে যাওয়ার দুটি শর্ত, এটাকে আপনি AND gate বলতে পারেন। দুটি শর্তই পূরণ করতে হবে। শর্ত দুটি হল- :

১. ইমান আনা।

২. ভালো কাজ করা। (কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ কাজ এটা আল্লাহ কুরআনে বিস্তারিত বর্ননা করেছেন)

তাই, কেও শুধুমাএ ভালো কাজ করলে জান্নাতে যেতে পারবে না, তাকে অবশ্যই আল্লাহর প্রতি ইমান রাখতে হবে। তেমনিভাবে, কেও শুধু মাএ মুখে মুখে ইমান আছে বলে বেড়ায়, কিন্তু ভালো কাজ করে না, তাকে কুরআনের কোথাও জান্নাতের প্রতিশ্রুতি আল্লাহ দেয় নাই।

এখন বুঝতে পারছেন, শত ভালো কাজ থাকা সত্বেও যাদের ইমান নাই তাদের অবস্থান কোথায় হবে?

আবার, যারা মুখে ইমানের কথা বলে বেড়ায়, কিন্তু কাজের বেলায় মন্দ কাজ করে তাদের অবস্থান কোথায় হবে?

শরীয়াহ

শরিয়াহ শব্দের অর্থ খাবার পানির উৎস। তাই, মানুষের আনুগত্যের সোর্সকেও শরিয়াহ বলা হয়। আমাদের জন্য আল্লাহর পাঠানো শরিয়াহ হচ্ছে আসমানি কিতাব/কোরআন।

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ও অভিধান প্রণেতা হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (মৃত্যু ৩৯৫ হিজরী) তার বিখ্যাত গ্রন্থ "মাকায়িস আল-লুগাহ" তে এই শব্দের সংজ্ঞাতে লিখেন- শরীয়তের অভিধানিক অর্থ হচ্ছে খাবার পানির উৎস।

দুনিয়াতে আমরা কিভাবে চলবো তার উৎস হতে পারে আমাদের সামাজিক সংস্কৃতি, রাষ্ট্রের নীতি অথবা কোরআন।

খাবার পানির উৎসে যেমন পানি থাকে, তাকে আরবরা শরিয়া বলত। তেমনিভাবে, রাষ্ট্রের সকল নিয়ম-নীতি এবং সংবিধানের উল্লেখ থাকে, তাই সংবিধানও শরিয়া। অফিস কিভাবে চলবে সেটাও শরিয়া।

আর আল্লাহর শরিয়া হচ্ছে কোরআন।

সুতরাং, আল্লাহর শরীয়তে থাকে শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশ।

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا
"তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরীআত ও স্পষ্ট কর্মপন্থা।"
[Al-Ma'idah 5:48]

পিপাসা লাগলে যেমন পানির উৎস থেকে মানুষ পানি নিয়ে খায়, তেমনিভাবে দুনিয়ায় চলতে হলে করণীয় কী তা আল্লাহর শরীয়ত কুরআন থেকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা নিয়ে মানুষ চলবে।

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰي شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ
"তারপর আমি তোমাকে আমাদের আদেশ দিয়ে তৈরি শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।"
[Al-Jathiyah 45:18]

আমরা অনেকে মনে করি হত্যার বদলে হত্যা, চুরি করলে হাত কাটা ইত্যাদিই শুধুমাত্র শরীয়ত। কিন্তু এই রকম শাস্তিমূলক ফৌজদারি (শাস্তিমূলক) আয়াত আছে ৮-১০টি। মানুষ মনে করে এই ৮-১০টি আয়াতই শরীয়ত। অথচ কুরআনে আয়াত আছে ৬৬৬৬টি।

কিন্তু, পুরো কুরআনে মানুষের করণীয় যা বলা আছে, সবই শরীয়ত।

- বাবা-মায়ের সাথে ভালো ব্যবহার শরীয়ত
- ন্যায়বিচার শরীয়ত
- সময়মতো বেতন দেওয়া শরীয়ত
- যাকাত দেওয়া শরীয়ত

কুরআনে উল্লেখিত আমাদের করণীয় সবই শরীয়ত।

ডাক্তার সাবিল আহম্মেদ এর একটা চমৎকার উপমা আছে, শরিয়াহ সম্পর্কে-

ধরুন, ভিনগ্রহ থেকে কিছু এলিয়েন এসে আপনার কাছে জানতে চাইল, আমেরিকার শাসন ব্যবস্থা কেমন?

আপনি শুরু করলেন বলার, "আমেরিকার বিচার ব্যবস্থা খুব কঠোর। তারা বিভিন্ন পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড দেয়।"

- তারা আরিযোনা (Arizona) অঙ্গরাজ্যে লেথাল ইঞ্জেকশান দিয়ে মৃত্যদন্ড দেয়।
- তারা ভারজিনিয়া (virginia)অঙ্গরাজ্যে ইলেকট্রিক সক দিয়ে মৃত্যদন্ড দেয়।
- তারা দিলাওয়ার (Delaware)অঙ্গরাজ্যে ফাঁশি দিয়ে মৃত্যদন্ড দেয়।
- তারা উথা (Utha)অঙ্গরাজ্যে গুলি করে মৃত্যদন্ড দেয়।

এই তথ্য শুনে এলিয়েনরা নিজ গ্রহে ফিরে গিয়ে বলল, "পৃথিবীর মানুষ খুবই বর্বর। সেখানে আমেরিকা নামে একটি দেশ আছে, যারা বিভিন্ন পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড দেয়।"

তবে আপনি যে শুধু মৃত্যুদণ্ডের কিছু পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন, সেটি আমেরিকার সংবিধানের মাত্র ০.১%-০.২%। আমেরিকার সংবিধানে রয়েছে শিক্ষাব্যবস্থা, গণতন্ত্র, রাজনীতি, ট্রাফিক সিস্টেম, অর্থনীতি, স্বাস্থ্যসেবা, বিচার ব্যবস্থা, এবং আরো অনেক কিছু।

তেমনি, আমরা যখন শরিয়া আইন নিয়ে কথা বলি, আমরা শুধু শাস্তি বিধানের ৪-৫টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করি, যা সম্ভবত শরিয়া আইনের ০.০০১২%-০.০০১৫%(কুরআনের ৮-১০টি আয়াত) এর বেশি নয়।

আমরা মনে করি, শরিয়া আইন শুধু শাস্তি সম্পর্কিত, কিন্তু আসলে এর মধ্যে রয়েছে:

- গরিব, এতিম, প্রতিবেশীর অধিকার, যাকাত সিস্টেম

- শিক্ষাব্যবস্থা, পরিবার, অর্থনীতি

- লেনদেন, আচরণ, পররাষ্ট্রনীতি, স্ব-রাষ্ট্রনীতি

- বিচার ব্যবস্থা, পোশাক, রাজনীতি, ফৌজদারি আইন

উদাহরণস্বরূপ, পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করা শরিয়া আইনের অংশ। আল্লাহ বলেন:

"আমি (আল্লাহ) মানুষকে পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি... এবং তোমার পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা আদায় করো।"

[সূরা লোকমান ৩১:১৪]

আর সবার ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা শরিয়া আইনই। আল্লাহ বলেন:

"ধর্মে কোন জোরজবরদস্তি নেই।"

[সূরা বাকারা ২:২৫৬]

ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, কেউ চাইলেই বিশ্বাস করতে পারে এবং কেউ না চাইলেও তা অস্বীকার করতে পারে।

[সূরা আল কাহাফ ১৮:২৯]

যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করে, তাদের গালি-গালাজ করা উচিত নয়।

[সূরা আল আনআম ০৬:১০৮]

শরিয়া আইন সম্পর্কে সবচেয়ে বড় ভুল ধারণা হলো, সর্বমোট ৪টি দণ্ড বিধানের পদ্ধতিকে শুধুমাত্র শরিয়া আইন মনে করা। পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই অলরেডি কিছু না কিছু শরিয়া আইন বুঝে হোক অথবা না বুঝে হোক তা বাস্তবায়িত আছে, যার কারনে মানুষের জীবন অমুসলিম দেশগুলোতেও সুসংগত। অর্থাৎ শরিয়া আইনের কিছু বিষয় পৃথিবীর সব দেশেই কিছু না কিছু আছেই, না হয় ঐদেশে বসবাস করা যাইতো না।

সবার জন্য সু-শাসন নিশ্চিত করা শরিয়া আইন

হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবসময় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় থাকো এবং সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দাও। এমনকি এই সত্যের সাক্ষ্য যদি তোমার নিজের, তোমার পিতা-মাতা, অথবা আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়, তবুও সত্যের পক্ষে দাঁড়াও। সে ব্যক্তি ধনী হোক বা গরিব, আল্লাহর অধিকার তাদের উভয়ের ওপরই বেশি। বিচার করতে গিয়ে তোমরা কখনো পক্ষপাতিত্ব বা নিজের ইচ্ছা-খুশি মেনে চলো না। যদি সত্যকে এড়িয়ে পেঁচানো কথা বলো, কিংবা বিচার করা থেকে বিরত থাকো, তবে মনে রেখো—আল্লাহ তোমাদের সব কাজ সম্পর্কে সব জানেন।

(সূরা আন-নিসা ৪:১৩৫)

নারী ও পুরুষের মাঝে শরিয়া আইনে কোনো বৈষম্য নেই:

শরিয়া আইনে ধনী ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ দিতে বাধ্য, আর যার অর্থনীতি খারাপ, সে-ও তার সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীকে খরচ দেবে।

(সূরা আত-তালাক ৬৫:৭)

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সম্পর্কে শরিয়া আইন কী বলে?

শরিয়া আইনে অনুমানভিত্তিক কথা বলা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে, কারণ কিছু অনুমান অপরাধ বা পাপ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

(সূরা আল হুজরাত ৪৯:১২)

হে ঈমানদারগণ! তোমরা কখনোই অন্যের ঘরে তাদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদের প্রতি সালাম না জানিয়ে প্রবেশ কোরো না।
(সূরা আন-নূর ২৪:২৭)

কিছু ভুল ধারনা-

১/ধরুন, আমি নিজেকে মুসলিম হিসাবে দাবী করি, কিন্তু মাঝে মাঝে নামাজ পরি, মাঝে মাঝে পরি না, শরিয়া আইন আসলে কি আমাকে জোর করে নামাজ পরতে বাধ্য করবে??

২। আমাকে কি বোরকা পরতে বাধ্য করবে?

৩/ আমাকে কি সিগারেট খাওয়া বন্ধ করে দিবে?

উত্তর একটাই-

"ধর্মে কোন জোরজবরদস্তি নেই।"

[সূরা বাকারা ২:২৫৬]

শরীয়াহ আইনের মডেল রাষ্ট্র ছিল -মদিনা। মদিনার সব মানুষ কি নামাজ পড়ত? মদীনায় কি কোন অমুসলিম ছিল না? মদীনায় কি চিহ্নিত মোনাফিক ছিল না? মদীনাতে কি মদ পাওয়া যেত না? মদীনায় কি ইহুদী এবং অন্য ধর্মাবলীদের জন্য আলাদা বিচার ব্যবস্থা ছিল না? ধর্মীয় যুদ্ধে কি সকল মুসলমান দাবীদার যুদ্ধে যাইতো? সকল নারী কি হিজাব পড়ত? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারলেই, শরীয়াহ সম্পর্কে সকল ভুল ধারনা কেটে যাবে।

আমরা মানুষকে দাওয়াত দিতে পারি, কিন্তু পরিস্থিতি তৈরি করে বাধ্য করার এখতিয়ার নাই। আপনারাই বলেন, কুরানেতো মদ খেতে নিষেদ করেছে, তা সত্ত্বেও ইসলামি রাষ্ট্র গুলোতে মদের যোগান কে দিত। খলিফা ওমর (রাঃ) আমলেও মদ কেন্দ্রিক কিছু ঘটনা আমরা জানি।

মানুষ কেন, ইসলামি শরিয়াহ মুখে চাইতেছি বললেও, মন থেকে চায় না। কারন হচ্ছে ভয়। একটা শক্তি এমনভাবে ইসলামকে উপস্থাপন করে, মনে হয় ইসলামি বিশ্বে স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই।

পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান হল – রাসুল (সঃ) এর কর্তৃক প্রণীত মদিনা সনদ-

1. রাষ্ট্রের মুসলিম এবং অমুসলিম সকল শ্রেণীর মানুষ সমান নিরাপত্তা ও সমান সযোগ সুবিধা পাবে।
2. আমুসলিমরা মুসলিম দের মত সমান রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সুবিধা পাবে। অমুসলিমদের নিজস্ব স্বায়ত্তশাসন থাকবে এবং স্বাধীন ভাবে তারা তাদের ধর্ম তারা পালন করবে।
3. রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এর জন্য মুসলিম – অমুসলিম সবাই শত্রুর মোকাবেলায় কাজ করবে এবং সবাই খরচ বহন করবে। মুসলিম অমুসলিম কেও কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না।
4. মুসলিমদের ধর্ম যুদ্ধে অমুসলিমদের অংশগ্রহনের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাদকতা নেই।

সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ন যে বিষয়টা, যেটা ফোকাসে আনা হয়না সেটি হচ্ছে যদি কেও চায় যে, তারা শরিয়া আইনে বিচার চায় না, নিজেদের প্রতিষ্ঠিত আইন, অথবা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় আইনে বিচার চায়, তাহলে শরিয়া আইন তা মেনে নিবে কি??

আল্লাহ্‌র দেয়া শরীয়া সিস্টেমে প্রত্যেকের যেমন নিজস্ব ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে, ঠিক তেমনিভাবে প্রত্যেকের নিজস্ব আদালত থাকবে? রাষ্ট্রের যে কোন মানুষ যে কোন আদালতে বিচার নিয়ে যেতে পারবে। সেখানে যেমন ব্রিটিশ ল কেন্দ্রিক আদালত থাকবে, হিন্দু আদালত থাকবে, কমিউনিস্ট দের যদি নিজস্ব সিস্টেমে বিচার থাকে সেটাও থাকবে, আবার কুরআনের আদালতও থাকবে, আরও যদি থাকে সেটাও থাকবে। বাদী যেখানে বিচার নিয়ে যেতে চায়, সে আদালতের নিয়ম অনুসারে বিচার হবে। আবার, বাদী যদি মনে করে তার প্রতি জুলুম হচ্ছে, সেটারও সমাধান আছে।

এই রকম ডাইভার্স বিচারিক সিস্টেম রাসুল সঃ থেকে শুরু করে ১৯২০ সাল পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে বিদ্যমান ছিল।

সূরা আল মায়েদা (০৫:৪২) তারা (যারা শরিয়া আইন চায় না) যদি কখনো (কোন বিচার নিয়ে) তোমার কাছে আসে, (হে মোহাম্মদ) তুমি চাইলে তাদের বিচার করতে পারো কিংবা তাদের উপেক্ষা করতে পারো, যদি তুমি তাদের উপেক্ষা করো তাহলে (নিশ্চিত থাকো) এরা কখনো তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তবে যদি তুমি তাদের বিচার ফয়সালা করো তাহলে অবশ্যই ন্যায় বিচার করবে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ন্যায় বিচারকদের ভালোবাসেন।

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট আল্লাহ্‌র রাসুল যখন মদিনার শাসক ছিলেন, সেখানে কুরানিক আদালতের বাহিরে অন্য আদালতও ছিল, যেখানে মানুষ বিচার নিয়ে যাইতো।

আবার আল্লাহ বলেন,

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা তাগূতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে।

An-Nisa' 4:60

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট, যারা ইমানের দাবী করেছে, তারাও তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যাইতে চাইতো। তাই, ইসলামি রাষ্ট্রে প্যারালাল অনেক গুলো বিচারিক আদালত থাকবে। যে যেখানে খুশি সেখানে বিচার নিয়ে যাবে।

শাস্তির বিধান কিসে কিসে আছে?

কোরানে শাস্তির বিধান চারটি ক্ষেত্রে বলা হয়েছে এবং মদের শাস্তির কথা এসেছে হাদিসে:
শাস্তির যে বিধানগুলো কোরানে আছে, আপনি নিজেকে ভিক্টিমের স্থানে বসিয়ে তারপর শাস্তির বিধানগুলো নিয়ে চিন্তা করুন।

১. মিথ্যা সাক্ষ্য:

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার শাস্তির কথাও কোরানে বলা হয়েছে। কেউ আপনার মা-বোনের নামে মিথ্যা ব্যভিচারের জঘন্য অপবাদ তুলল, তার কী শাস্তি হওয়া উচিত না?

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةً وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدًاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ

"যারা পবিত্র নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়, তারপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়, তাদের আশি বেত্রাঘাত করো এবং তাদের সাক্ষ্য কখনোই গ্রহণ করো না। তারা প্রকৃতপক্ষে দুরাচার।"

(সূরা আন-নূর ২৪:৪)

২. দুর্নীতি / চুরি:

কোরআন অনুযায়ী, চুরি এবং অবৈধ সম্পদ গ্রহণের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে।

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"চোর, পুরুষ হোক বা নারী, তাদের হাত কেটে দাও; এটা তাদের কর্মের প্রতিফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে উদাহরণমূলক শাস্তি। আল্লাহ মহাশক্তিশালী, প্রজ্ঞাময়।"

(সূরা আল মায়েদা ৫:৩৮)

২. ব্যভিচার:

কেউ ধরুন আপনার মাকে অথবা বোনকে ধর্ষণ করল, তার শাস্তি কী হওয়া উচিত?

"ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ—তাদের প্রত্যেককে একশ' বেত্রাঘাত করো।"

(সূরা আন-নূর ২৪:২)

পাথর মেরে হত্যার বিধানটি কোরানে নেই, হাদিসে আছে। তবে, বর্ণনাকারী রাবি আবদুল্লাহ্ ইবনু আবূ আওফা (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রাসুল (স) এর পাথর মেরে হত্যা করার যে হাদিসটি, তা কি সূরা আন-নূর ২৪:২ নাজিল হওয়ার আগে না পরে, রাবি আবদুল্লাহ্ ইবনু আবূ আওফা (রাঃ) বলেছিলেন তিনি জানেন না।

শায়বানী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ্ ইবনু আবূ আওফা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথর মেরে হত্যা করেছেন কি? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সূরায়ে নূর-এর আগে না পরে? তিনি বললেন, আমি জানি না। [বুখারী ৬৮১৩, ৬৮৪০; মুসলিম ২৯/৬, হাঃ ১৭০২] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৩৪৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৩৫৭)

৪. কেসাস (প্রতিশোধ/বদলা নেওয়া):

কারো জীবন বা সম্পত্তির বিনিময়ে সমান প্রতিশোধ নেওয়ার শাস্তির বিধান কেসাস।

وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٞ لَّهُۥۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

"তাদের প্রতি আমি বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং ক্ষতের জন্য সমান প্রতিশোধ। তবে যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দেবে, সেটাই হবে তার জন্য পাপমোচন। আর যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার করবে না, তারা অত্যাচারী।"

(সূরা আল মায়েদা ৫:৪৫, সূরা আল বাকারা ২:১৭৮-১৭৯)

৫. মদ:

কোরানে মদ বর্জন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, তবে শাস্তির বিষয়টি হাদিসে এসেছে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُ

"হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিসমূহ এবং ভাগ্য নির্ধারণকারী শরগুলি শয়তানের অপবিত্র কর্ম। সুতরাং এগুলো থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।"
(সূরা আল মায়েদা ৫:৯০)
মদ্যপানের শাস্তি প্রসঙ্গে হাদিসে বলা হয়েছে।
(আবু দাউদ, হুদুদ ৩৫-৩৭)

এর বাইরে আর কোন ফৌজদারী বিধানের কথা শরিয়াতে নেই। অথচ মানুষ শরীয়া বলতে শুধু মাত্র এই চার-পাঁচটি ফোজদারী বিচার ব্যবস্থাকেই বুঝে।

চিন্তা করুন,

একদিন আপনি নিজের পরিবার নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করছিলেন। কিন্তু এক রাতে আপনার ঘরে চোর ঢুকে পড়ল। আপনার স্ত্রীর প্রিয় গয়না, সন্তানের খেলনা—সবকিছু লুট করে নিয়ে গেল। আপনি অসহায়ভাবে তাকিয়ে ছিলেন, আর মনে পড়ল কোরানের বিধান: "চোরের হাত কেটে দাও; এটা তাদের কর্মের প্রতিফল।" (সূরা আল-মায়েদা ৫:৩৮)

এরপর সমাজে আপনার বোনের নামে মিথ্যা অপবাদ রটানো হলো। আপনার বোন, যাকে আপনি এত ভালোবাসেন, তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠল। তার নির্দোষতা জানার পরও মানুষ তাকে অপমান করল। আপনার মনে হলো, কোরানে কী বলা আছে: "যারা মিথ্যা অপবাদ দেয়, তাদের আশি বেত্রাঘাত করো।" (সূরা আন-নূর ২৪:৪)

আপনার মাকে, যিনি সবসময় সম্মানের সাথে জীবনযাপন করেছেন, রাস্তায় এক অপরাধী লাঞ্ছিত করল। আপনি মনে মনে চিৎকার করলেন, এই অপরাধের শাস্তি কী হতে পারে? তখন মনে পড়ল কোরানের নির্দেশনা: "ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ—তাদের প্রত্যেককে একশ' বেত্রাঘাত করো।" (সূরা আন-নূর ২৪:২)

এরপর আপনার ছোট ছেলেকে হত্যা করা হলো, বিনা কারণে, নিষ্ঠুরভাবে। আপনার বুক ফেটে যাচ্ছিলো, আর মনে পড়ল আল্লাহর বিধান: "প্রাণের বদলে প্রাণ..." (সূরা আল-মায়েদা ৫:৪৫)

এরপর আপনার স্ত্রী, যাকে আপনি সবসময় রক্ষা করতে চেয়েছেন, মদের প্রভাবে থাকা এক ব্যক্তির দ্বারা লাঞ্ছিত হলো। তখন মনে পড়ল, আল্লাহ আমাদের সতর্ক করেছেন: "মদ তো শয়তানের অপবিত্র কর্ম।" (সূরা আল-মায়েদা ৫:৯০)

এইসব অন্যায় যখন আপনার চারপাশে ঘটছে, তখন আপনি উপলব্ধি করেন আল্লাহর দেওয়া শাস্তির বিধান আমাদের সুরক্ষার জন্য, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য। আপনি ভাবেন, এই বিধান ছাড়া এই পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কীভাবে সম্ভব?

এখন, শরীয়াভীতি দূর করার ব্যাপারে আমাদের করনীয় কি?

এই ভীতি দুরকরনে, ব্যবসায় Branding কিভাবে করা হয়, তা বুঝা দরকার।
বর্তমানে Brand এর নামের ক্ষেত্রে মিনিংফুল অর্থ কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, তাও বুঝা দরকার।
বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অনলাইন মার্কেট হচ্ছে দারাজ (Daraz).
দারাজ একটি উর্দু শব্দ,যার অর্থ হচ্ছে- ড্রয়ার. যেহেতু উর্দু শব্দ, তো এটার অর্থ আমাদের না জানাটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু, দারাজ বলার সাথে সাথে আমাদের চোখে দারাজের ওয়েবসাইট ভেসে উঠে, দারাজের গাড়ি ভেসে উঠে, অনলাইনে কিছু অর্ডার দিলে তাদের লোকজন এসে জিনিসপাতি বাসায় দিয়ে যায় ভেসে উঠে।
কিন্তু, আলমারির ড্রয়ার বা টেবিলের ড্রয়ার একবারের জন্যও ভেসে উঠে না।
তেমনিভাবে, আল্লাহর দেয়া শরিয়া কুরআনের কথা বললে হাত কাটা, মাথা কাটার ছবি ভেসে উঠে, কিছু রাজাকারের ছবি ভেসে উঠে, এক গ্রুপ অন্য গ্রুপের রগ কেটে দিচ্ছে তা ভেসে উঠে, মন্দির ভাঙ্গার ছবি ভেসে উঠে। কেননা, মিডিয়া মানুষের চৌখে এই নাটকগুলো শত হাজারবার মঞ্চায়িত করতেছে।
অথচ কুরানের শরিয়ার সৌন্দর্য একবারের জন্যও আমাদের চৌখে ভেসে উঠে না, একবারো আমাদের চৌখে ভেসে উঠে না মদিনার রাস্ট্র, মদিনার সংবিধানের ছবি ।
প্রশ্ন হচ্ছে কেন উঠে না, কারন যারা শরীয়াহকে রিপ্রেজেন্ট করতে চায় তাদের Branding knowledge হয়তোবা কম, এবং তাদের প্রতিপক্ষের Branding knowledge এর কাছে তারা পরাজিত।
আবার, অনেকে ইসলামটাকে শুদ্ধ উচ্ছারন এবং মুখস্থ বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে পেলেছে। যারা শরিয়া এর কথা বলে, তাদের অনেকে শরীয়াহ এর মানে বুঝে না, মদিনার সনদ বুঝে না, কুরআন বুঝে পড়ে না।
এখন করনীয়,
ইসলামের সৌন্দর্য, মদিনা রাস্ট্রের সৌন্দর্য মানুষের সামনে মার্কেটিং এর সকল টুল ব্যবহার করে, বারবার নাটক পুনঃ মঞ্চায়িত করে ফুটায় তুলতে হবে। যাতে শরীয়াহ শব্দ বলার সাথে সাথে মানুষের চৌখে মদিনার রাস্ট্র ভেসে উঠে।
ড. গালিব এর একটি উক্তি দিয়ে শেষ করি-
জ্ঞান হইল ইনসাইট বুঝা, এক্সট্রাপোলেট করতে জানা, নতুন প্রবলেম সলভ করার স্কিল ডেভেলপ করা। মুখস্থ বিদ্যা আর শুদ্ধ বানানে কপি পেস্ট করতে শিখা না।
তাই, আমাদেরকেও শরিয়াহ বুঝতে হবে, এবং সত্যটা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে মানুষের ভুল ধারনা দূর করতে হবে।

দ্বীন

আনুগত্যের বিষয়সমূহকে একসাথে "দ্বীন" বলে।

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ও অভিধান প্রণেতা হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (মৃত্যু ৩৯৫ হিজরী) তার বিখ্যাত গ্রন্থ "মাকায়িস আল-লুগাহ" তে এই শব্দের সংজ্ঞাতে লিখেনঃ দ্বীন হচ্ছে ঐ বিষয়সমূহ যা মানুষ মেনে চলে (it is a matter to be obeyed)।

আল্লাহ বলেন:

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ

_"আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া বাদশাহ (আজীজের রাষ্ট্রীয়) দ্বীনে সে তার ভাইকে রেখে দিতে পারত না..."_

(সূরা ইউসুফ ১২:৭৬)

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট—বাদশাহদেরও নিজস্ব দ্বীন থাকে, যা মানুষজনদেরকে মেনে চলতে হয়। এ রকম পৃথিবীতে শত শত দ্বীন রয়েছে। আপনার এলাকার সংস্কৃতি আপনার এলাকার দ্বীন, যেমন: "না ভাই, যৌতুক দিতেই হবে, এটা আমাদের এলাকার কালচার।" এই পরিবেশটিই এলাকাভিত্তিক দ্বীন।

আর আল্লাহর দ্বীন হচ্ছে—আল্লাহ যা যা মানুষকে মেনে চলতে বলেছে, সেসবকে একসাথে আল্লাহর দ্বীন বলে।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ

"তারা কি আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য কিছু তালাশ করছে?"

(সূরা আল ইমরান ৩:৮৩)

আমাদের কাছে কুরআনের দ্বীন ভালো লাগে না, আমরা বলি ব্রিটিশ দ্বীন পারফেক্ট। তাই আমরা পশ্চিমা আইন, জীবনব্যবস্থা সব তালাশ করি।

আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

"আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন চায়, তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

(সূরা আল ইমরান ৩:৮৫)

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট—আমাদেরকে অন্য কোনো দ্বীন অনুসন্ধান করার সুযোগ আল্লাহ দেননি।

আল্লাহ বলেন:

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।"

(সূরা আল ইমরান ৩:১৯)

ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর কাছে একমাত্র দ্বীন। শুধুমাত্র এই দ্বীন দিয়ে কি দুনিয়া চালানো যাবে?

আল্লাহ বলেন:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে পছন্দ করলাম।"

(সূরা আল মায়িদা ৫:৩)

আল্লাহ বলেছেন, এটি পরিপূর্ণ; তাই নিঃসন্দেহে সব কিছুর সমাধান পাওয়া যাবে। যদি আমরা খুঁজে না পাই বা প্রয়োগ করতে না পারি, তাহলে সেটি আমাদের ব্যর্থতা।

আল্লাহ বলেন:

اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ

"তোমরা দ্বীন কায়েম করবে।"

(সূরা আশ-শুরা ৪২:১৩)

যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত, তাদের জন্য দাওয়াত দেওয়া সহজ। প্রথমে মানুষকে কালেমার দাওয়াত দিন। যখন তারা মেনে নিবে যে আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য করা যাবে না, তখন তাকে এই আয়াত স্মরণ করিয়ে দিন: আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন বাস্তবায়ন করতে হবে। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করুন—আপনি কি করবেন?

ইসলাম ও মুসলিম

- ইসলাম: ইসলামের শাব্দিক অর্থ হলো কারো ইচ্ছার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করা বা আত্মসমর্পণ করা। ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহর দেয়া সকল আনুগত্যের বিষয় সমূহ কাজে রূপ দিতে হবে অর্থাৎ সকল আনুগত্যের বিষয় সমূহ বিনাশত্বে মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে,এই আইডিয়া বা কনসেপ্ট বা ধারণাকে ইসলাম বলে।
- মুসলিম: যারা নিজেকে অন্যের ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে তাদেরকে মুসলিম বলে। আর ইসলামি পরিভাষায়, যারা আল্লাহর আনুগত্যের বিষয় সমূহ অনুযায়ী প্রাক্টিক্যালি কাজ করে তাদেরকে মুসলিম বলে।

৭ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইবনে মানযুর (৭১১ হি.) তাঁর বিখ্যাত অভিধান **লিসান আল-আরাব**-এ উল্লেখ করেছেন যে, "ইসলাম" শব্দটি "সালাম" (سلم) ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা ও আত্মসমর্পণ। ইসলামের শাব্দিক অর্থ হলো আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর আদেশ মেনে চলার মাধ্যমে জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন করা।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, ইসলাম শব্দটির আরেকটি ব্যাখ্যা হলো **ইস্তিসলাম** (الاستسلام), যার অর্থ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি সমর্পিত হওয়া, যা শুধুমাত্র মুখের স্বীকারোক্তি নয় বরং বিশ্বাস, কর্ম এবং চিন্তার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

(সূত্র: ইবনে মানযুর, লিসান আল-আরাব)

ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ করা এবং অনুগত হওয়া। আভিধানিকভাবে **ঈমান হলো বিশ্বাসের দিক এবং ইসলাম হলো কর্মের দিক**। এটা একটি ধারণা বা কনসেপ্ট, যেমন গণতন্ত্র, কমিউনিজম, জাতীয়তাবাদ—এইসবই একেকটি কনসেপ্ট।

উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবীতে অনেকগুলো গণতান্ত্রিক সিস্টেম আছে, কিন্তু পশ্চিমারা যে গণতন্ত্রের কথা বলে, সে গণতন্ত্রে সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। আর ইসলাম হল আল্লাহ যা যা আমাদেরকে মেনে চলতে বলেছেন, সেগুলোর ব্যাপারে অনুগত থাকা।

ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন - ইসলাম হলো আল্লাহর নির্দেশের প্রতি আত্মসমর্পণ করা এবং অনুগত থাকা। ঈমান ও ইসলামের মধ্যে আভিধানিক পার্থক্য রয়েছে।

ধরি, পরীক্ষার আগে আপনি বিশ্বাস করেন যে ভালো ফল পেতে হলে প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে আপনি পড়েন না। কেবল বিশ্বাস থাকলেই যে প্রাকটিক্যাল কাজ হবে, তা নয়।

এ কারণে কুরানে শুধু ঈমানদারদের জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়নি। আপনাকে বিশ্বাসের সাথে সাথে কাজও করতে হবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ
"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যথাযথ ভয়। আর তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মারা যেও না।"
(আল-ইমরান ৩:১০২)

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, শুধু মুমিন হলে হবে না, আমাদের মুসলমানও হতে হবে। কিভাবে মুসলমান হবো? যারা প্রাকটিক্যালি আল্লাহর আনুগত্য মেনে কাজ করে, তাদেরকে মুসলিম বলা হয়।

আবার আল্লাহ বলেন-

لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَي الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰي ؕ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَي الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۙ

যেসব ঈমানদার অক্ষম নয় অথচ (জেহাদে না গিয়ে ঘরে) বসে থাকে তারা এবং নিজেদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদকারীরা সমান হতে পারে না। নিজেদের জানমাল দিয়ে জেহাদকারীদেরকে আল্লাহ (ঘরে) বসে থাকা লোকদের চেয়ে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। প্রত্যেককে আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আর আল্লাহ জেহাদকারীদেরকে বড় পুরষ্কার দিয়ে (ঘরে) বসে থাকা লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন

An-Nisa' 4:95

দেখা যাচ্ছে যে ইমান আনা সত্ত্বেও যুদ্ধের হুকুম পালন করতেছে না। অর্থাৎ ইমান আছে, কিন্তু কাজ নাই সে অনুসারে।

আবার, আল্লাহ বলেন-

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

বেদুঈনরা বলল, ‘আমরা ঈমান আনলাম’। বল, ‘তোমরা ঈমান আননি’। বরং তোমরা বল, ‘আমরা মুসলিম হয়েছি’। আর এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তাহলে তিনি তোমাদের আমলসমূহের কোন কিছুই হ্রাস করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

Al-Hujurat 49:14

এইখানে দেখা যাচ্ছে, ইমান নাই, কিন্তু আল্লাহ যেভাবে চলতে বলতেছে, প্র্যাক্টিক্যালি কাজের ক্ষেত্রে সেভাবে কাজ করতেছে।

তাই , আমাদেরকে শুধুমাত্র ইমান আনলেও হবে না, আবার শুধুমাত্র মুসলিম হলেও হবে না। আমাদেরকে জান্নাতে যেতে হলে ইমানও আনতে হবে এবং মুসলিমও হতে হবে।

আবার আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۫ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

আর যে ঈমানের সাথে কুফরী করবে, অবশ্যই তার আমল বরবাদ হবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

Al-Ma'idah 5:5

দেখা যাচ্ছে, ইমানের সাথে কুফুরিকেও অনেকে অন্তরে লালন করে। কিন্তু তা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহনযোগ্য নয়।

এই আয়াতগুলো থেকেও স্পষ্ট, শুধু ইমান থাকলে হবে না, ইমানদারদের আল্লাহ যা যা করতে বলেছে, যা যা বিশ্বাস করতে বলেছে সবই করতে হবে।

সুতরাং, সকল মুমিন কিন্তু মুসলমান নাও হতে পারে। আল্লাহ মুমিনদেরকে যে কাজ করতে বলেছেন, সেগুলি বাস্তবায়ন করলে তবেই তারা মুসলিম হবে।

ইসলাম সম্পর্কে সবচেয়ে বড় ভুল ধারণা হল— ইসলামকে একটি নতুন ধর্ম মনে করা, যা মুহাম্মদ (সঃ) শুরু করেছেন। এই কারণে অনেকে বলে— আল্লাহ দুনিয়াতে এত ধর্ম পাঠালেন কেন? অথচ, আদম (আঃ) থেকে শুরু করে মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ) সহ সকল নবীর ধর্ম ছিল একটাই। সেটা হলো ইসলাম। ইহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু বা যে নামেরই ধর্ম থাকুক না কেন, তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন— আপনার ধর্মের নাম যে এটা, তা আপনার প্রধান ধর্মগ্রন্থ থেকে প্রমাণ দিন। দেখবেন, দিতে পারবে না। পারবে কোথা থেকে! এটি তো তাদের পূর্বপুরুষদের দেওয়া নাম। ধর্মের বিকৃতি এবং সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী আল্লাহ যুগে যুগে প্রতিটি জাতির কাছেই রাসূল পাঠিয়েছেন, আর সবাই ইসলামের দিকেই দাওয়াত দিয়েছেন। নামটা ভাষাগতভাবে আলাদা থাকলেও, অনুবাদ করলে দেখবেন অর্থ একটাই— শুধুমাত্র এক আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে।

[আল কুরআন (৪২:১৩)]: তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারণ করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। আপনি আল্লাহর সাথে শিরককারীদের যে বিষয়ের প্রতি আমন্ত্রণ জানান, তা তাদের কাছে কঠিন বলে মনে হয়।

আর আমরা অবশ্যই প্রত্যেক জাতির মধ্যে এক-একজন রসূল পাঠিয়েছি এই বলে— "আল্লাহর ইবাদত কর এবং আল্লাহ-বিরোধী শক্তিগুলোকে বর্জন কর।"

[আল কুরআন (১৬:৩৬)]

ইব্রাহীম ইহুদি ছিলেন না এবং খ্রিষ্টানও ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন ‘হানীফ’ অর্থাৎ (সব মিথ্যা ধর্মের প্রতি বিমুখ এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী) এবং মুসলিম, এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

[আল কুরআন (৩:৬৭)]

ইসলাম যে একমাত্র সকল নবীর ধর্ম ছিল, তা পূর্বকার আসমানী কিতাবগুলোতে এখনো পাওয়া যায়। মূসা (আঃ) এর ধর্ম ছিল ইসলাম— এক আল্লাহর আনুগত্য করা। রেফারেন্স:
- তাওরাত (জেনেসিস ১৭:৩)
- তাওরাত (এক্সোডাস ২০:৩)
- তাওরাত (ডিউট্রোনমি ৬:৪)

ঈসা (আঃ) এর ধর্ম ছিল ইসলাম— এক আল্লাহর আনুগত্য করা। রেফারেন্স:
- বাইবেল (মার্ক ১২:২৯)
- বাইবেল (ম্যাথিউ ২৬:৩৯)

আবার, আমরা যদি হিন্দু ধর্মের দিকে তাকাই তাহলে দেখি-
১.ঋগ্বেদ, বই ৮, স্তবক ১, শ্লোক ১
তিনি পবিত্র, তিনি ব্যতিত আর কারো উপাসনা করো না, শুধু তার স্তূতি করো।
২.ঋগ্বেদ, বই ৬, স্তবক ৪৫, শ্লোক ১৬
শুধুমাত্র তারই স্তূতি করো যিনি তুলনাহীন ও একক।
৩. যজুর্বেদ, অধ্যায় ৩২,শ্লোক ৩
"ন তস্য প্রতিমা আস্তি"
তার কোন প্রতিকৃতি নেই।
৪.ঋগ্বেদ, বই ১, স্তবক ১৬৪, শ্লোক ৪৬
"ইকাম সাত বিপরা বহুধা বদান্তি"
জ্ঞানী পুরোহীতরা এক ইশ্বরকে বহু নামে ডাকেন
৫.ভগবত গীতা ৭:২০
জাগতিক আকাঙ্ক্ষা যাদের জ্ঞান বুদ্ধিকে চুরি করেছে, তারাই মানুষের গড়া স্রষ্টার পূজা করে।
৬. ছান্দোগ্য উপনিষদ, অধ্যায় ৬, সেকশন ২ শ্লোক ১.
"ইকাম ইভানদ্বিতীয়াম"
তিনি(ইশ্বর) এক, যার কোন দ্বিতীয় নেই।
৭. শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, অধ্যায় ৬,শ্লোক ৯.
তার(ইশ্বরের) কোন পিতামাতা নেই।
৯.শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, অধ্যায় ৪,শ্লোক ২০.
তার আকৃতি দেখা যায় না, কেউ তাকে চোখে দেখতে পায় না
ঠিক তেমনিভাবে,
মুহাম্মদ (সঃ) এর ধর্ম ছিল ইসলাম— এক আল্লাহর আনুগত্য করা।

রেফারেন্স:
আল কুরআন (৩:১৯, ২:২৫, ১৬:৩৬, ৩:৬৭, ৪২:১৩)

আদম (আঃ) এসে এক আল্লাহর আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। মানুষ এক আল্লাহর আনুগত্য বাদ দিয়ে মূর্তি পূজা শুরু করল। (হিন্দু বা সনাতন ধর্ম) এরপর নূহ (আঃ) এসে এক আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিলেন, কিছুদিন পর মানুষ সূর্যের পূজায় লিপ্ত হল (এথেনিজম)। তারপর ইব্রাহীম (আঃ) এসে এক আল্লাহর আনুগত্যের কথা বললেন। এরপর কিছু নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান-ভিত্তিক ধর্ম (বৌদ্ধ ধর্ম) মানুষ নিয়ে আসল। এরপর মূসা (আঃ) এবং ঈসা (আঃ) আসলেন। সর্বশেষ মুহাম্মদ (সঃ)-এর মাধ্যমে নবী পাঠানো বন্ধ করে দিলেন আল্লাহ।

এই নবীদের মধ্যে আল্লাহ কোনো পার্থক্য করেননি। কিন্তু আমরা বলি— উনি শ্রেষ্ঠ নবী, উনি কম শ্রেষ্ঠ, যা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক।

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ

[আল বাকারা (২:২৮৫)]

মুমিনরা বলে— আমরা রাসূলগণের মধ্যে কারও মধ্যে তারতম্য করি না।

কুফর ও কাফের

- কুফরঃ "(কাফ, ফা ও রা) তিন অক্ষরের ক্রিয়ামূলটি একটি বিশুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করে, তা হল: 'আবৃত করা বা গোপন করা'। কোন ব্যক্তি যদি তার পরিহিত বর্মকে তার কাপড় দিয়ে আবৃত করেন, তবে বলা হয় তিনি তার বর্ম 'কুফর' করেছেন। চাষীকে 'কাফির' (আবৃতকারী) বলা হয় কারণ তিনি শষ্যদানাকে মাটি দ্বারা আবৃত করেন।" ইসলামি পরিভষায় কেও যদি আল্লাহ্‌র বিধানকে অপছন্দ দিয়ে আবৃত করে, তবে সে কুফর করল'
- কাফের: যে কুফর করে তাকে কাফের বলে। আর ইসলামি পরিভাষায়, যে আল্লাহর আনুগত্যসমূহ এর যে কোন এক বা একাদিককে অপছন্দ দিয়ে ঢেকে দেয়, তাকে কাফের বলে। **কাফের বিশ্বাসগত মুশফিক কর্মগত।**

৪র্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ আবুল হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস [মৃত্যু ৩৯৫ হিজরী] বলেন: "(কাফ, ফা ও রা) তিন অক্ষরের ক্রিয়ামূলটি একটি বিশুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করে, তা হল: 'আবৃত করা বা গোপন করা'। কোন ব্যক্তি যদি তার পরিহিত বর্মকে তার কাপড় দিয়ে আবৃত করেন, তবে বলা হয় তিনি তার বর্ম 'কুফর' করেছেন। চাষীকে 'কাফির' (আবৃতকারী) বলা হয় কারণ তিনি শষ্যদানাকে মাটি দ্বারা আবৃত করেন।"

তাই কুরানে আল্লাহ চাষীকেও কাফের বলেছেন: **وَكَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ**
এর উদাহরণ হলো বৃষ্টির মতো, যার উৎপন্ন ফসল কাফিরদের (কৃষকদের) আনন্দ দেয়।
(আল-হাদিদ ৫৭:২০)

ঈমান বা বিশ্বাসের বিপরীত অবিশ্বাসকে কুফর বলা হয়; কারণ অবিশ্বাস হলো সত্যকে অপছন্দ দিয়ে আবৃত করা। অকৃতজ্ঞতা বা নিয়ামত অস্বীকার করাকেও কুফর বলা হয়; কারণ এতে নিয়ামত লুকানো হয় এবং আবৃত করা হয়। [৯] ইবনু ফারিস, মু'জামু মাকাইসিল লুগাহ ৫/১৯১

আল্লাহ যা আমাদের জন্য নাজিল করেছেন, তা মানুষের পছন্দ হওয়া উচিত। এখন কেউ যদি তা তার অপছন্দের চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়, তবে ইসলামের পরিভাষায় সে কাফের।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ
আর যারা কুফরী করে, তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস এবং তিনি তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। অতএব তিনি তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছেন।
(মুহাম্মদ ৪৭:৮-৯)

এবার আপনি চিন্তা করুন, আমাদের শাসকরা কি আল্লাহর বিধানকে পছন্দ করে? আমরা নিজেরা কি আল্লাহর সব বিধানকে পছন্দ করি? কিন্তু, আল্লাহ কুরআনে বলতেছে, যারা আল্লাহ্‌র বিধানকে অপছন্দ করে তারা কাফের। এই মানদণ্ডে আমার আপনার অবস্থান কোথায় একটু চিন্তা করুন!

আল্লাহ আরো স্পষ্ট করে বলেছেন: **وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ**
আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।
(আল-মায়িদা ৫:৪৪)

আল্লাহ যা নাজিল করেছে, সে অনুযায়ী ফয়সালা আপনার পছন্দ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আপনি চিন্তা করলেন ব্রিটিশ "আইন" এর থেকে ভালো, আবার চিন্তা করলেন, আমার বোনকে কেন কুরআনের বিধান অনুসারে এত সম্পত্তি দিব? যদি আপনি মন থেকে আল্লাহর ফয়সালাকে অপছন্দ দিয়ে ঢেকে দেন, তাহলে কুরাআনের ভাষায় আপনি কাফের।

এখন, আপনি চিন্তা করছেন, আমি তো সব কিছু অপছন্দ করছি না। আল্লাহ বলেছেন: **وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ**
আর যে ঈমানের সাথে কুফরী করবে, তার আমল বরবাদ হবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।
(আল-মায়িদা ৫:৫)

আর ঈমান আনার পূর্ব শর্তও কিন্তু কুফর করা। এই কুফর হচ্ছে শাব্দিক অর্থে যে কুফর বুঝায় সেটি: **فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ**
যে ব্যক্তি তাগূতকে কুফর করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে...
(আল-বাকারা ২:২৫৬)

তাগূত কে? যারা অবাধ্যতার সীমা অতিক্রম করে, তাদেরকে তাগুত বলা হয়। এমনকি অত্যাচারেরও একটা সীমা থাকে; যারা সেই সীমাও অতিক্রম করে, তাদেরকেও তাগুত হিসেবে গণ্য করা হয়। আরব ভাষার অভিধানবিদ আল-খলিল রহিমাহুল্লাহ বলেন, তাগুত হলেন নিষ্ঠুর এবং জালেম শাসক বা নেতা।

ঈমান আনার পূর্ব শর্ত হল তাগূতকে কুফর করা/অপছন্দ দিয়ে আবৃত করা। অর্থাৎ তার অন্যায় আদেশকে নাকচ করতে হবে। এর পর যখন আপনি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবেন, তখন সেই ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে। আর যেহেতু আপনি কোন তাগূতকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন না, তাই আপনার ঈমানের রশি কখনো ছিঁড়বে না, কারণ আপনি অন্য কারো আদেশই মানছেন না।

শিরক ও মুশরিক

- শিরক: শারাকা (شَرَكَ) এর মূল ধারণা হল—শেয়ারিং এবং পার্টনারশিপ (অংশীদারিত্ব)। শিরক শব্দটি বোঝায় এমন অধিকার বা কোন কিছু যা দুই বা তার অধিক জনের মধ্যে ভাগ করা হয় এবং কোন একজন একা সেই অধিকার বা বস্তু পায় না। আর ইসলামি পরিভাষায়, শিরক শব্দের অর্থ অংশীদার করা।, সমস্ত আনুগত্য আল্লাহর অধিকারে। এখন আপনি যদি আল্লাহর আনুগত্যের স্থলে অন্য কারো আনুগত্য করেন, তাহলে আল্লাহর অধিকারে আপনি অন্য কাওকে অংশ দিলেন। কেননা আরেকজনের আনুগত্য করার অধিকার তো আপনাকে দেয়া হয়নি। আল্লাহর আনুগত্যে অন্য কাওকে অংশীদার করাকে ইসলামী পরিভাষায় শিরক বলে।
- মুশরিক: যে অংশীদার বা শিরক করে তাকে মুশরিক বলা হয়। ইসলামি পরিভাষায়, যারা আল্লাহর আনুগত্যের স্থলে অন্যের আনুগত্য করে তাদেরকে মুশফিক বলে।

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ও অভিধান প্রণেতা হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (মৃত্যু ৩৯৫ হিজরী) তার বিখ্যাত গ্রন্থ "মাকায়িস আল-লুগাহ" তে এই শব্দের সংজ্ঞাতে লিখেনঃ **শারাকা (شَرَكَ)** এর মূল ধারণা হল—শেয়ারিং এবং পার্টনারশিপ (অংশীদারিত্ব)। শিরক শব্দটি বোঝায় এমন অধিকার বা কিছু যা দুই বা তার অধিক জনের মধ্যে ভাগ করা হয় এবং কোন একজন একা সেই অধিকার বা বস্তু পায় না। উদাহরণস্বরূপ:

- আমি ফাহাদের সাথে কিছু ভাগাভাগি করেছি।
- আমি ফাহাদের সাথে পার্টনার হয়েছি।
- ফাহাদকে আমি আমার পার্টনার বানিয়েছি।
- [আল কুরআন, Ta Ha 20:32] {وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي} অর্থাৎ (মুসা (আঃ) আল্লাহ্র কাছে তার ভাই হারুন সম্পর্কে বললেন, হে আল্লাহ) তাকে আমার কাজে অংশীদার করো।
- অনেকে আল্লাহ্র কাছে কিছু চাওয়ার সময় বলে: **اللهم أشركنا في دعاء المؤمنين**অর্থাৎ "হে আল্লাহ, আমাদেরকে মুমিনদের দোয়ায় অংশীদার বানাও।"

যে অংশীদার বা শিরক করে তাকে মুশরিক বলা হয়। কিন্তু দুনিয়াতে আমরা বেশিরভাগ কাজে একে অপরের অংশীদার হই, তাহলে কি আমরা সবাই মুশরিক?

ইসলামী পরিভাষায়, আনুগত্য পাওয়ার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। তাই যে কোন আনুগত্যের ব্যাপারে আমাদেরকে কুরআনের কাছে যেতে হয়। এখন, আল্লাহ্র এই আনুগত্যের স্থলে কেও যদি অন্য কাউকেও আংশিক বা সম্পূর্ণ আনুগত্য দেয়, তবে তাকে মুশরিক বলা হয়।

যেমন: আমরা জানি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদাহ দেওয়া শিরক। তাহলে, আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে আদমকে সেজদাহ করতে বললেন এবং ফেরেশতারা সেজদাহ করলো, তাহলে কি ফেরেশতারা মুশরিক হয়ে গেল?

না, ফেরেশতারা মূলত আল্লাহ্‌র আনুগত্য করেছে। কিন্তু তারা যদি আল্লাহ্‌র আনুগত্য মেনে আদমকে সেজদাহ না করতো, তাহলে তারা মুশরিক হয়ে যেত। আল্লাহ কুরআনে সুরা আনাম ৬:১২১ এ বলেছেন: "আল্লাহ্‌র আনুগত্যের স্থলে যদি অন্য কারো আনুগত্য করো, তবে তোমরা মুশরিক।"

আরবিতে শিরক অর্থ অংশীদার হওয়া (to share, be partner, associate)। ইশরাক ও তাশরিক অর্থ "অংশীদার করা" বা "সহযোগী বানানো" অর্থে ব্যবহার করা হয়।

কুফর বিশ্বাসগত, আর **শিরক** কর্মগত।

আল্লাহ বলেন: **وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ**
আর যদি তোমরা (আল্লাহকে আনুগত্য করার বদলে) তাদের আনুগত্য কর, তবে নিশ্চয় তোমরা মুশরিক।
(আল-আন'am ৬:১২১)

সকল আনুগত্য হবে আল্লাহর, যেটি আল্লাহ কুরআনে বলেছেন। এখন আপনি চিন্তা করলেন, আমি কিছু আল্লাহর আনুগত্য করব, কিছু মনের আনুগত্য করব, আর কিছু অন্য কারো।

দেখুন, কালেমার মাধ্যমে ঘোষণা দিলেন- আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য করবেন না, কিন্তু প্রাকটিক্যালি যেখানে আল্লাহ পুরোপুরি আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য, সেখানে আপনি আল্লাহর স্থলে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অন্য কাউকে আনুগত্যের অংশীদারত্ব দিচ্ছেন, অর্থাৎ আপনি শিরক করছেন আল্লাহর সাথে।

ধরুন, আমার পাঁচ বিঘা জমি আছে। এখন আপনি চিন্তা করলেন এক বিঘা জমি অন্য কাউকে দিয়ে দিবেন। এটি অবৈধ কারণ আমার জমি কাউকেই আংশিক বা পূর্ণভাবে দেওয়ার অধিকার আপনার নেই।

তেমনি, সব আনুগত্য শুধুমাত্র আল্লাহর অধিকার। এখন অন্য কাউকে আনুগত্য দিলে আপনি শিরক করেছেন, এবং যে শিরক করে তাকে মুশরিক বলা হয়।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা দেওয়ার শিরক, কেন শিরক? কারণ এটি আল্লাহর আনুগত্যের লঙ্ঘন।

লোক দেখানো নামাজ পড়া শিরক। কেন শিরক? কারণ আপনি আল্লাহর আনুগত্যের স্থলে মনের আনুগত্য মেনে নিয়ে, লোক দেখানো নামাজ পড়ছেন। এখানে আনুগত্য মানুষের/মনের।

আনুগত্য যার, ইবাদত হয় তার। আর আপনি আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য করলে, সেটি আল্লাহর সাথে শিরক।

আল্লাহ বলেন: **إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ**
নিশ্চয় শিরক হল বড় যুলম।
(লুকমান ৩১:১৩)

যুলুম হলো কোন কিছুকে তার উপযুক্ত স্থান থেকে সরিয়ে অন্য স্থানে রাখা। যুলুম সবসময় কর্মগত, বিশ্বাসগত নয়।

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ
আর আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করবে না, তারাই যালিম।
(আল-মায়েদা ৫:৪৫)

আপনি যদি আল্লাহর ফয়সালাকে অপছন্দ করেন, তাহলে আপনি কাফের। কিন্তু যদি আপনি কেবল অপছন্দের ভিতর সীমাবদ্ধ না থেকে প্রাকটিক্যালি আল্লাহর ফয়সালা অনুসারে বিচার না করেন, তাহলে আপনি যালেম।

আল্লাহ বলেন:

اِتَّخَذُوْۤا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَعْبُدُوْۤا اِلٰـهًا وَّاحِدًا ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

যে বিষয়ে আল্লাহ নিজেকে রব দাবি করেছে, সেবিষয়ে তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের (ধর্মীয় আলেম) যাজক ও পাদ্রীদেরকে এবং মরিয়মের পুত্র (তাদের নবী ঈসা) মসীহকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।অথচ তাদেরকে একেবারেই কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নাই যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে। (কেননা), আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (বা আনুগত্য মেনে কাজ পাওয়ার যোগ্য কেও) নাই। আল্লাহ সকল অযোগ্যতা থেকে মুক্ত, তা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর সাথে অনেককে অংশীদার করে।
(আল-কুরআন, আত-তাওবাহ ৯:৩১)

১৭০০ সালের আগে, ইউরোপসহ পৃথিবীতে আইন তৈরি করতেন ধর্মীয় ব্যক্তিরা। তারা আল্লাহর বিধানের স্থলে অন্য বিধান দিত বলে, আল্লাহ তাদেরকে রব হিসেবে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু এখন আইন তৈরি হয় পার্লামেন্টে। তাহলে এখন রবের আসনে বসে আছে পার্লামেন্ট।

প্রশ্ন হচ্ছে, পার্লামেন্ট, ধর্মীয় নেতারা নিজেদের স্বার্থে আল্লাহর জায়গায় নিজেদেরকে রবের মর্যাদায় বসায় রাখছে। কিন্তু নবীকে কিভাবে খ্রিষ্টানরা আল্লাহর পরিবর্তে রব বানালো? হিসাব সহজ—নিঃসন্দেহে, নবীরা আল্লাহর আদেশের বাইরে কিছু করার নির্দেশনা দেননি। কিন্তু তারা মারা যাওয়ার পর তারা এই বলেছে, সে বলেছে বলে মিথ্যা জাল হাদিস বানিয়ে সে অনুসারে চলছে, অথচ সে ব্যাপারে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাজিল করেননি। তাই ইসলামী পরিভাষায় বলা যায়, আল্লাহর আনুগত্যের স্থলে অন্য কারো আনুগত্য করা মুশরিকি।

নিফাক ও মুনাফিক

- নিফাকঃ, এটি দিয়ে এমন পথ বুঝায় যেখান থেকে গোপনে বাহির হওয়া যায়। ইসলামি পরিভাষায়, যারা মুখে ইমানের দাবি করলেও অন্তরে কুফরি লুকিয়ে রাখে অর্থাৎ ইমান থেকে গোপনে বাহির হয়ে থাকে।
- মুনাফিক: মুনাফিক হল এমন ব্যক্তি যে বাইরের চেহারায় আল্লাহর আনুগত্য পছন্দ করে দেখায় কিন্তু মনের ভিতরে আল্লাহর আনুগত্যসমূহকে অপছন্দ করে।

৪র্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইসমাইল ইবনু হাম্মাদ আল-জাওহারী (তাজ আল-লুগাহ ওয়া সিহাহ আল-আরাবিয়্যাহ) বলেন-মুনাফিক হল এমন ব্যক্তি যে বাইরের চেহারায় ঈমান দেখায় কিন্তু ভিতরে কুফরি লুকিয়ে রাখে।

আল খলিল বলেন-

একজন লোক ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন- **(সূরা আল-আনআম ৬:৩৫ আয়াতের)** ن ف ق [নফাকা] এর অর্থ কী?"

اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ

"মাটির মধ্যে কোন সুড়ঙ্গের সন্ধান কর।"
(সূরা আল-আনআম ৬:৩৫)

তিনি (ইবনু আব্বাস) বললেন, "এটি মাটির নিচের একটি গোপন পথ বোঝায়, যা দিয়ে তুমি পালিয়ে যেতে পারবে।"

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ও অভিধান প্রণেতা হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (মৃত্যু ৩৯৫ হিজরী) তার বিখ্যাত গ্রন্থ “মাকায়িস আল-লুগাহ” তে এই শব্দের সংজ্ঞাতে লিখেনঃ (نَفَقَ) শব্দের মূল ধাতু তিনটি বর্ণ নিয়ে গঠিত: নুন (ن), ফা (ف), এবং কাফ (ق)। এর দুটি প্রধান অর্থ আছে, যেগুলো একটি সাধারণ ধারণাকে প্রকাশ করে। একটি অর্থ হলো কোনো কিছুর শেষ হওয়া বা চলে যাওয়া, আর অন্যটি হলো কোনো কিছুকে লুকানো বা গোপন করা। তবে যখন এই দুইটি ধারণা একত্রিত হয়, তাদের মধ্যে মিল দেখা যায়।

প্রথম অর্থ:

-"النَّفَقَةُ" অর্থ হলো যা খরচ করা, খরচ করলে সম্পদ বের হয়ে যায়।

-"أَنْفَقَ الرَّجُلُ" (আনফাকা আর-রজুল) মানে হলো সেই ব্যক্তি দরিদ্র হয়ে গেছে, অর্থাৎ যা কিছু তার কাছে ছিল তা শেষ হয়ে গেছে। ইবনু আল-আরাবি বলেন: এটি আল্লাহর বাণী সূরা আল-ইসরা (১৭:১০০) "إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ" থেকে নেওয়া হয়েছে যার অর্থ "তাহলে তোমরা ব্যয়ের ভয়ে (তোমাদের সম্পদ) আটকে রাখতে।

দ্বিতীয় অর্থ:

- "النَّفَقُ" অর্থ হলো মাটির নিচে একটি সুড়ঙ্গ যা অন্য কোথাও গিয়ে শেষ হয়।

- "النَّافِقَاءُ" অর্থ হলো সেই স্থান যেখানে ইঁদুর গর্তে ঢুকে বিপদ আশঙ্কা করলে পালানোর জন্য, সুড়ঙ্গের আরেক মুখ মাটির উপরের স্তরের কাছাকাছি পর্যন্ত করে রাখে, পুরোপুরি মাটি সরায় না। যা পাতলা মাটির ঢাকনা হিসাবে থাকে, ফলে মাটির উপর থেকে বোঝার উপায় থাকে না, এটার নিচে ইঁদুরের গর্ত আছে।। যদি তাকে পিছনের দিক থেকে ধরা হয়, সে মাথা দিয়ে সেই গর্তটি ভেঙে বেরিয়ে যায়। এখান থেকেই "نِفَاق" (মুনাফিকি) শব্দের উৎপত্তি, কারণ মুনাফিক তার ভিতরের

কুফরিকে লুকিয়ে রাখে এবং বাহ্যিকভাবে ঈমান প্রকাশ করে। এটি এমন একজন ব্যক্তির মত যে ঈমান থেকে গোপনে বেরিয়ে আসে।

- এই ধারণাটি একটি সাধারণ বিষয়কে প্রকাশ করতে পারে, তা হলো 'বেরিয়ে আসা'।

- "النَّفَقُ" অর্থ হলো একটি পথ যা দিয়ে বের হওয়া সম্ভব।

এই ধারণাটি একটি সাধারণ বিষয়কে প্রকাশ করতে পারে, তা হলো কোন জায়গা থেকে কোন কিছু বাহির হওয়া বুঝায়। এটা টাকা পয়সা বাহির হওয়া হইতে পারে, এইটা আমাদের শরির থেকেও কিছু বাহির হওয়া হইতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট, নাফাকা দিয়ে এমন পথ বুঝায় যেখান থেকে গোপনে বাহির হওয়া যায়। আর যে এই পথে চলাচল করে তাকে মোনাফেক বলে।

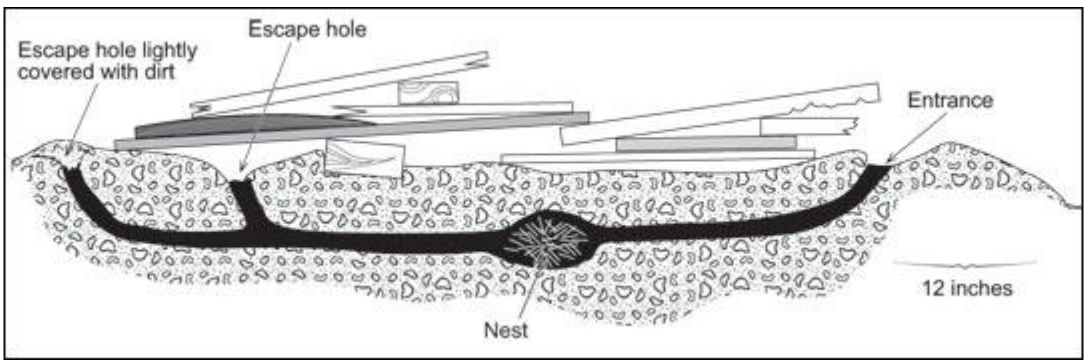

ছবিঃ ইঁদুরের তৈরি সুড়ঙ্গ পথ, যেখানে সে বসবাস করে।

ইঁদুরের প্রতিরক্ষা মূলক সুড়ঙ্গ পথের ধারনা ধারনা থেকেই "نِفَاق" (মুনাফিকি) শব্দের উৎপত্তি। তাই, মুনাফিক চিনতে হলে, ইঁদুরের তৈরি করা সুড়ঙ্গ পথের/গর্তের ধারনা দরকার-

ইঁদুরের সুড়ঙ্গের প্রতিরক্ষামূলক কৌশল

ইঁদুর তাদের জীবন রক্ষার জন্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরিকল্পনা করে সুড়ঙ্গ তৈরি করে। এই কৌশলগুলোর মধ্যে প্রধান তিনটি হলো: প্রধান প্রবেশদ্বার, গোপন বহির্গমন পথ, এবং সুড়ঙ্গের সাধারণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

প্রধান প্রবেশদ্বার

ইঁদুরদের সুড়ঙ্গ ব্যবস্থার প্রধান প্রবেশদ্বারটি তাদের বাসস্থান এবং খাদ্য সংগ্রহের জন্য মূল পথ। এটি সাধারণত একটি বড়, মসৃণ খোলা স্থান যা ২ থেকে ৪ ইঞ্চি ব্যাসের হতে পারে। এই প্রবেশদ্বারটি ইঁদুরের চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং মাটির উপরের স্তরের অংশে অবস্থিত।

- **বৈশিষ্ট্য:** প্রধান প্রবেশদ্বারটি সাধারণত পরিচিত এবং ব্যবহারিক হয়, তাই এটি বারবার ব্যবহার করা হয়। প্রবেশদ্বারটি সাধারণত পরিষ্কার থাকে এবং প্রায়ই মাটির চারপাশে কিছু নতুন খোঁড়া মাটি দেখা যায়।

গোপন বহির্গমন পথ

ইঁদুরের সুড়ঙ্গ ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা কৌশল হলো গোপন বহির্গমন পথ। এই পথগুলি প্রাথমিকভাবে বিপদ থেকে পালানোর জন্য তৈরি করা হয় এবং প্রধান প্রবেশদ্বারের কাছাকাছি লুকানো থাকে।

- **বৈশিষ্ট্য:** গোপন বহির্গমন পথগুলো সাধারণত মাটির প্রাকৃতিক আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়, যা বাইরের দৃষ্টিতে বোঝা যায় না। বিপদের সময়, ইঁদুরেরা দ্রুত এই মাটির আবরণ সরিয়ে পালিয়ে যায়। বাংলাদেশে দেখবেন গ্রামের রান্না ঘরে বা জোপজাড়ে এই রকম গর্ত আছে,
- **কার্যকরী কৌশল:** এই গোপন পথগুলি তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, কারণ ইঁদুরদের যদি প্রধান প্রবেশদ্বার থেকে পালানোর প্রয়োজন হয়, তারা দ্রুত এই গোপন পথ দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে।

সুড়ঙ্গের সাধারণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

ইঁদুরেরা তাদের সুড়ঙ্গ ব্যবস্থায় প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতে কয়েকটি কৌশল অবলম্বন করে:

- **মাটির আবরণ:** সুড়ঙ্গের বহির্গমন পথগুলো প্রাকৃতিক মাটি দিয়ে ঢেকে রাখা হয়, যা শিকারিদের চোখে ধোঁকা দেয়। এই মাটি সহজেই সরানো যায় কিন্তু বাইরের জন্য অদৃশ্য থাকে।
- **বিপদ সঙ্কেত:** ইঁদুরেরা প্রধান প্রবেশদ্বার এবং গোপন পথের কাছাকাছি থাকা কোনো অস্বাভাবিক পরিবর্তন বা সঙ্কেত খুব দ্রুত অনুভব করতে পারে। তারা সেই সঙ্কেতের ভিত্তিতে দ্রুত পালানোর ব্যবস্থা করে।
- **পালানোর পথ:** যদি কোনো কারণে প্রধান প্রবেশদ্বার ব্যাহত হয়, ইঁদুরেরা তাদের গোপন বহির্গমন পথ ব্যবহার করে নিরাপদে পালাতে পারে। এই প্রক্রিয়া তাদের জীবন বাঁচানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এই কৌশলগুলো ইঁদুরদের তাদের সুড়ঙ্গ ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে এবং তাদের শিকারি ও অন্যান্য বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে।

বাংলাদেশে দেখবেন,রান্না ঘরের চিপায় চাপায় পা পরলে, হঠাৎ করে পা দেবে যাচ্ছে, অথবা কোন কারনে রান্না ঘরে বৃষ্টির পানি পড়লে গর্ত হয়ে যাচ্ছে, অথবা বৃষ্টির পরে ফসলের মাঠে গর্ত হয়ে যায় কিন্তু এই মাটির নিচে যে ইদুরের গর্ত ছিল তা বুঝার উপায় ছিল না, মাটির ঐ জায়গায় পা পড়ার আগ পর্যন্ত বা গর্তের বহির্গমন প্রাকৃতিক মাটি দিয়ে ঢেকে রাখা আবরন ভেঙে ইদুর পালিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত।

ইদুর যেমন নিজেকে এই সুড়ঙ্গ পথে লুকিয়ে রাখে, আর তার পালানোর মুখ এমনভাবে প্রাকৃতিক ঢাকনা দিয়ে রাখে যে, এর নিচে ইঁদুরের গর্ত আছে বুঝার উপায় থাকে না। তেমনিভাবে,

মোনাফেকরা ঠিক ইদুরের মত তাদের কুফর লুকিয়ে রাখে, মুমিনদের কাছে নিজেদের পাক্কা মুসলমান হিসাবে প্রকাশ করে।

মুনাফেকদের মনে থাকে কুফরি, ঠিক যেমনিভাবে ইঁদুরের বাসস্থান তার সুড়ঙ্গ পথ।

মোনাফেকরা ইসলামের পৌশাক দিয়ে নিজেদের ঢেকে রাখে, কিন্তু ভিতরে পুরাটা কুফরি।

যেমনিভাবে, ইঁদুরও তার গর্তের পালানোর মুখ নেচারাল মাটি দিয়ে ঢেকে রাখে, বুঝার উপায় থাকে না, এই মাটির নিচে ইঁদুরের গর্ত আছে।

মোনাফেকের যদি কোন কুফরি কর্ম কান্ডের আপনি খোঁজ পান, সে ইমানের দোহাই দিয়ে, ইমানের পৌশাক দেখিয়ে বেঁচে যায়।

যেমনিভাবে, ইঁদুরেরও কোন গর্ত খুজে ধরতে গেলে, সে তার প্রাকৃতিক আবরন দিয়ে ঢাকা মুখটা দিয়ে পালিয়ে যাবে।

মুনাফিক মুমিনদেরকে মিথ্যা বলে যে, সে আল্লাহর আনুগত্য পছন্দ করে এবং সে অনুসারে কাজ করে, কিন্তু মন থেকে সে আল্লাহর আনুগত্যসমূহকে অপছন্দ করে এবং সুযোগ বুঝে কর্মে তা প্রকাশ করে, তাই তাকে মুনাফিক বলা হয়।

কুরআনে বর্ণিত মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যাক:

মিথ্যাবাদীঃ

اِنَّ الۡمُنٰفِقِیۡنَ لَکٰذِبُوۡنَ
"নিশ্চয় মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।"
(Al-Munafiqun 63:1)

মুনাফিকদের এইটাই মূল বৈশিষ্ট্য । ওয়াদা দিয়ে ওয়াদা খেলাপ করা, এটা মিথ্যা ওয়াদা, আমানত রক্ষা করবে বলে, আমানত রক্ষা না করাও মিথ্যা। এই কারনে আল্লাহ মুনাফিকদের মিথ্যাবাদী বলেছেন।

আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তাদের- ধরুন, কেও মুখে মিথ্যা বলল না বা সে এমন ভাবে মিথ্যা বলে যা বুঝা কঠিন, তখন তাদের কিভাবে চিনবেন-

১। মুহুর্তের মধ্যেই সম্পর্ক বদলে ফেলে -
کَاَنَّهُمۡ خُشُبٌ مُّسَنَّدَۃٌ
"তারা দেয়ালে ঠেস দেওয়া কাঠের মতোই।"
(Al-Munafiqun 63:4)

অর্থাৎ, সে সুযোগ বুঝে সমর্থন তুলে নেয়।

২। বুঝতে চায় না, নিজে যেটা বুঝে সেটাই গুরুত্ব দেয়।
فَهُمۡ لَا یَفۡقَهُوۡنَ

"তারা বুঝতে চায় না।"
(Al-Munafiqun 63:3)

৩। নিজেকে বড় মনে করে অন্যদের তুচ্ছ জ্ঞান করে।
وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ
"তারা অহংকার করে (অর্থাৎ নিজেদেরকে বড় মনে করে, অন্যদের ছোট মনে করে)।"
(Al-Munafiqun 63:5)

৪। নিজের সুবিধা মত আল্লাহ্‌র আনুগত্য ত্যাগ করে।

আল্লাহ বলেছেন:
اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ
"নিশ্চয় মুনাফিকরা হচ্ছে ফাসিক (আনুগত্য পরিত্যাগকারী) ।"
(At-Taubah 9:67)

তাহলে বলা যায়, মুনাফিকরা মুখে যা বলে, কাজে যা প্রকাশ করে, অন্তরে অন্য কিছু গোপন করে। আপনি তাদেরকে দুমুখো সাপও বলতে পারেন।

এবং এই মুনাফিকদের স্থান হবে:
اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا
"নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। আর তুমি কখনও তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না।"
(An-Nisa' 4:145)

আমরা বলতে পারি, যে নিফাক করে বা ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যখন যা সুবিধাজনক মনে করে তা প্রকাশ করে, সে মুনাফিক।

ইসলামী পরিভাষায়, যারা মুমিনদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য মিথ্যা বলে যে আমরা আল্লাহর আনুগত্য করি, তারা মুনাফিক।

জাহিলিয়্যাহ

- জাহিলিয়্যাহ: "جهل" (জাহিল) শব্দটি "علم" (জ্ঞান) এর বিপরীত। এটি অজ্ঞতা, অজ্ঞতার অবস্থা বা যেকোনো বিষয়ে জ্ঞানহীনতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।যেহেতু আল্লাহ সবচেয়ে বড় জ্ঞানী, তাই যে সমাজ শুধুমাত্র এক আল্লাহ্‌র আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না তাকে জাহিলিয়্যাহ সমাজ বলে।

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ও অভিধান প্রণেতা হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (মৃত্যু ৩৯৫ হিজরী) তার বিখ্যাত গ্রন্থ “মাকায়িস আল-লুগাহ” তে এই শব্দের সংজ্ঞাতে লিখেনঃ **"جَهِلَ" (Jahila) শব্দের** মূল অংশগুলি হল جيم (জিম), هاء (হা), এবং لام (ল্যাম)। এগুলি যে মৌলিক ধারণাকে নির্দেশ করে তা হলঃ

1. **জ্ঞানবর্জিত হওয়া** (অজ্ঞতা)

2. বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব

জাহিল(অজ্ঞাত) : এখানে "জাহিল" বলতে বোঝানো হয়েছে যে এটি জ্ঞানের বিপরীত। একটি স্থানের সম্পর্কে যদি কোনো জ্ঞান না থাকে, তাহলে সেই স্থানকে "মজহাল" (অজ্ঞাত) বলা হয়।

৪র্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ **ইসমাইল ইবনু হাম্মাদ আল-জাওহারী** (তাজ আল-লুগাহ ওয়া সিহাহ আল-আরাবিয়্যাহ) **"جهل" (Jahl) শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন-**

"جهل" (জাহিল) শব্দটি "علم" (জ্ঞান) এর বিপরীত। এটি অজ্ঞতা, অজ্ঞতার অবস্থা বা যেকোনো বিষয়ে জ্ঞানহীনতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

প্রধান শব্দগুলো:

1. **অজ্ঞতা (জাহিল):**
   - **অজ্ঞতা:** কাউকে যদি "জাহিল" বলা হয়, তাহলে তার অর্থ সে জ্ঞানহীন বা অজ্ঞ। "জাহল" বা "জাহিলা" শব্দদ্বয় ব্যবহার করে কাউকে অজ্ঞ বলা হয়।
   - **ব্যবহার:** "فلان جهل جهلاً وجهالة" (فلان অজ্ঞতা বা জ্ঞানের অভাব প্রকাশ করে)।
2. **মজহাল (مجهل):**
   - **মজহাল:** এমন একটি স্থান বা পরিস্থিতি যেখানে কোনো তথ্য বা নির্দেশনা নেই এবং যেখানে পথপ্রদর্শক অভাব।
   - **ব্যবহার:** "مجهل" বলতে এমন স্থান বোঝানো হয় যা পরিচিত বা জানা যায় না।

"جَهْل" (জাহিল) শব্দটি জ্ঞানহীনতা, অবহেলা, এবং অজ্ঞতার অবস্থাকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এটি কোনো বিষয়ের অভাব, পরিমাণ বা দক্ষতার অভাব বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়, এবং এতে অজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিভাষা অন্তর্ভুক্ত থাকে।

জাহিলিয়্যাহ শব্দটি জাহল থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ জ্ঞানহীনতা বা জ্ঞানের অনুসরণ না করা।

যে সমাজ শুধুমাত্র এক আল্লাহর আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না, তাকে জাহিলিয়্যাহ সমাজ বলা হয়। আল্লাহ হচ্ছেন সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। মানুষের উচিত, আল্লাহ যে নবীদের মাধ্যমে যা পাঠিয়েছেন, তা মেনে নেওয়া এবং অন্যদের মতবাদ বা চিন্তা ভাবনা প্রত্যাখ্যান করা। যেহেতু আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সেহেতু আল্লাহর জ্ঞানের বিপরীত যে কোনো মতবাদ বা চিন্তা চেতনা জ্ঞানহীনতার অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমান পৃথিবীতে যত সমাজ আছে, সবাই নিজ নিজ চিন্তা ভাবনার আলোকে অথবা কিছু কুরআনের কিছু মানুষের তৈরি মতবাদের মিশ্রণ দিয়ে পরিচালিত হয়।

এই কারণে সাইয়্যেদ কুতুব (র:) তার মাইলস্টোন বইতে কালেমার ব্যাখ্যায় গিয়ে জাহেলিয়াত সম্পর্কে বলেন - "মুসলিম সমাজ ছাড়া বাকি যত সমাজ আছে, সবই জাহেলি সমাজ।" আমরা যদি আরও স্পেসিফিক বলি, তাহলে বলা যায় - যে কোনো সমাজই জাহেলি সমাজ হতে পারে, যদি ঐ সমাজটা শুধুমাত্র এক আল্লাহর আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকে।

সাইয়্যেদ কুতুব আরও বলেন, এই সংজ্ঞা অনুসারে বর্তমান পৃথিবীতে যত সমাজ আছে, প্রত্যেকটা সমাজই জাহিলিয়্যাহ সমাজ। যদি রাষ্ট্রের সমস্ত রীতিনীতি আল্লাহর আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকে, তবে সে রাষ্ট্রও জাহিলিয়্যাহ রাষ্ট্র। ঠিক তেমনি, যে কোনো সংগঠন, সমাজ, পরিবার, অফিস যদি আল্লাহর আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকে, তবে এইগুলোর প্রত্যেকটাই জাহিলিয়্যাহ-এর অন্তর্ভুক্ত।

কুরআনে ৪ স্থানে কিভাবে জাহিলিয়াত রাষ্ট্রে, সমাজে, পরিবারে অথবা অফিসে থাকতে পারে তা বলা আছে:

1. **ইসলামী শরীয়া যেভাবে চিন্তা করতে শিখিয়েছে, সে ভাবে চিন্তা না করা জাহিলিয়াত।**
   তারা আল্লাহ সম্পর্কে অন্যায়ভাবে অজ্ঞতার ধারণা পোষণ করছিল। তারা বলছিল, "বিষয়টিতে আমাদের কি কিছু করার আছে?" বলো, "পুরো বিষয়টি আল্লাহর (হাতে)।" তারা তাদের মনে কিছু একটা লুকাচ্ছিল যা তোমার কাছে প্রকাশ করছিল না। তারা বলছিল, "বিষয়টিতে যদি আমাদের কিছু করার থাকত তাহলে এখানে আমরা (এভাবে) নিহত হতাম না।" বলো, "তোমরা যদি তোমাদের ঘরেও থাকো, তবুও যাদের নিহত হওয়া নির্ধারিত ছিল তারা তাদের মৃত্যুর জায়গায় বেরিয়ে আসবে।"
   (আলে ইমরান 3:154)
2. **আল্লাহর দেয়া শরীয়া আইন বিধানের পরিবর্তে মানুষের মন গড়া আইন বিধান চাওয়াও জাহিলিয়াত।**
   তাহলে কি তারা জাহিলিয়াতের বিচার-মীমাংসা কামনা করে? বিচারের ক্ষেত্রে দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর চেয়ে কে ভাল?
   (আল মায়দা 5:50)
3. **যা মন চায় তাই করে বেড়ানো এবং আল্লাহর আদেশ নিষেধ না মানাও জাহিলিয়াত।**
   "তোমরা তোমাদের ঘরে থাকবে এবং আগের অজ্ঞতাযুগের মত নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা মেনে চলবে।"
   (আল আহযাব 33:33)
4. **নিজেদেরকে সেরা মনে করে, অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করাও জাহিলিয়াত।**
   "কেননা কাফেররা তাদের অন্তরে অহমিকা (অন্যকে ছোট জ্ঞান করা)—জাহিলিয়াত যুগের অহমিকা—পোষণ করেছিল।"
   (আল ফাতহ 48:26)

বলা যায়, কুরআনের বাইরে সমাজ বা ব্যক্তিগত জীবনে যাই ঢুকে, তা জাহিলিয়াত। সুতরাং, প্রতিটি রাষ্ট্র, সমাজ, সংগঠন, পরিবার, অফিস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ সবাইকে চিন্তা করতে হবে আল্লাহ যেভাবে চিন্তা করতে শিখিয়েছেন, যেভাবে আইন করতে বলেছে সেভাবে আইন করতে হবে। মনের আনুগত্য, অন্যকে তুচ্ছজ্ঞান—এইসব পরিত্যাগ করতে হবে।

ফাসিক

ফাসিকঃ যে বা যারা আগে আল্লাহ্র আনুগত্য করত। এরপর যারা এক বা একাদিক বিষয়ে আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে বের হয় তাদেরকে ফাসিক বলে।

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ও অভিধান প্রণেতা হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (মৃত্যু ৩৯৫ হিজরী) তার বিখ্যাত গ্রন্থ "মাকায়িস আল-লুগাহ" তে এই শব্দের সংজ্ঞাতে লিখেনঃ ফাসিকের শাব্দিক অর্থ হলো আনুগত্য থেকে বের হওয়া।

ইসলামের পরিভাষায়—আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হওয়াকে ফিসক বলা হয়। যারা আনুগত্য থেকে বের হয় তাদেরকে ফাসিক বলে। এই বের হওয়া পুরোপুরি হতে পারে, আংশিকও হতে পারে।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ আর যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সিজদা করো। অতঃপর তারা সিজদা করল, ইবলীস ছাড়া। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার রবের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেল/রবের আদেশকে ফাসাকা করল। Al-Kahf 18:50

আমরা জানি, এই এক ঘটনার ছাড়া, অন্য কখনো সে আল্লাহর আনুগত্য লঙ্ঘন করেনি। কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহ যখন আদমকে সিজদা করতে বলল, এই এক ক্ষেত্রে সে আল্লাহর আনুগত্য করতে অস্বীকার করল। আর আল্লাহ তাকে ফাসিক বলছেন। এখন ভাবুন, আমরা প্রতিদিন কতগুলো বিষয়ে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাই।

আল্লাহ বলেন— وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ

আর যারা ফাসিকতা করে, তাদের বাসস্থান হবে আগুন।

As-Sajdah 32:20

হুকুমিয়াহ

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ও অভিধান প্রণেতা হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (মৃত্যু ৩৯৫ হিজরী) তার বিখ্যাত গ্রন্থ "মাকায়িস আল-লুগাহ" তে এই শব্দের সংজ্ঞাতে লিখেনঃ "حَكَمَ" (হাকামা) শব্দটির মূল অংশগুলি হল حاء (হা), كاف (কাফ), এবং ميم (মীম)। এই শব্দের মৌলিক ধারণা হল "রোধ" বা "বাধা"।

প্রধান ধারণা:

1. বিধি নির্ধারণ এবং রোধ:
   - **মূল অর্থ:** "حَكَمَ" শব্দটি সাধারণত ব্যবহার করা হয় এমন একটি সিস্টেম বা প্রক্রিয়া বোঝাতে যা অন্যায় বা ভুল আচরণকে রোধ করে।
   - **ব্যবহার:** "حَكَمَ" শব্দটি সাধারণত "বিচারক" বা "নির্ধারক" হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

2. **বিচার এবং প্রতিরোধ:**
    - **বিচার:** "حَكَمَ" বা "হাকামা" বলতে বোঝানো হয় যে একজন ব্যক্তি অন্যায় বা ভুল কাজের বিরুদ্ধে বিধি প্রয়োগ করছেন। এটি বিশেষত আইন, নীতি, বা সাধারণ আচরণের নিয়ন্ত্রণ বোঝায়।
    - **উদাহরণ:** "حَكَمْتُ السَّفِيهَ وَأَحْكَمْتُهُ" (আমি নির্বোধ ব্যক্তির হাতে নিয়ন্ত্রণ রেখেছি)।
3. **হাকামতা এবং প্রজ্ঞা:**
    - **হাকামতা:** "حِكْمَة" (হিকমা) বা প্রজ্ঞা এমন একটি গুণ যা অজ্ঞতা বা ভুলকে প্রতিরোধ করে। প্রজ্ঞা মানে হচ্ছে এমন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ যা অজ্ঞতা বা ভুল থেকে বিরত রাখে।
    - **উদাহরণ:** "الحِكْمَةُ تَمْنَعُ مِنَ الْجَهْلِ" (প্রজ্ঞা অজ্ঞতার প্রতিরোধ করে)।
4. **অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধান্ত:**
    - **মুহাক্কম:** "المُحَكَّمُ" (মুহাক্কম) বলতে বোঝানো হয় এমন একজন ব্যক্তি যিনি প্রজ্ঞা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষ।
    - **উদাহরণ:** কবি তরফা বলেছেন: "লেইত আল-মুহাক্কম ওয়াল-মাওযুঝ সওতাকুমা" (আমি আশা করি যে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি এবং সৎ মানুষ আপনার কথার প্রতি ধৈর্য ধরবেন)।
5. **বিচারক হিসেবে উল্লেখ:**
    - **হাকাম:** কোনো কিছুর উপযুক্ত বিচারক বা পর্যবেক্ষক হিসেবে উল্লেখ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামিক ঐতিহ্যে এমন ব্যক্তিরা যারা দ্বীনকে বুঝতে সক্ষম এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তাদের "মুহাক্কম" বলা হয়।

"حَكَمَ" (হাকামা) শব্দটি মূলত বিধি নির্ধারণ, প্রতিরোধ, বিচার এবং প্রজ্ঞার সঙ্গে সম্পর্কিত। এটি এমন একটি ধারণাকে বোঝায় যা ভুল, অজ্ঞতা, বা অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে রোধ স্থাপন করে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক।

৪র্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ আবুল হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস[মৃত্যু ৩৯৫ হিজরী] বলেন—(হা, কাফ, মিম) এর শাব্দিক অর্থ হলো "রোধ" বা "বাধা"।

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ নিশ্চয়ই, হুকুম/সিদ্ধান্ত একমাত্র আল্লাহরই। Yusuf 12:67

যেখানে আল্লাহর হুকুম আছে, সেখানে আর কারো হুকুম/সিদ্ধান্ত চলবে না।

এরপরও যদি কোনো বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে বিরোধ হয়, আমাদের করণীয় কী—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَاَطِيۡعُوا الرَّسُوۡلَ وَاُولِى الۡاَمۡرِ مِنۡكُمۡ ۚ فَاِنۡ تَنَازَعۡتُمۡ فِىۡ شَىۡءٍ فَرُدُّوۡهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوۡلِ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা আল্লাহর ও রাসূলের আনুগত্যের মধ্য থেকে আদেশ দেয়। এরপরও যদি কোনো বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ কর, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করো—যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখো। An-Nisa' 4:59

অন্যের হুকুম আমরা তখনই মানব যদি তা আল্লাহর আদেশের মধ্যে থাকে। রাসূলের আনুগত্য আমরা এইজন্যই করি, যেহেতু আল্লাহ করতে বলেছেন। তাই, রাসূলের আনুগত্যও আল্লাহর আনুগত্যের অংশ। কিন্তু তাই বলে, সূরা তওবায় বর্ণিত খ্রিস্টানদের মতো নবীকে রবের আসনে বসানো যাবে না। আল্লাহ যে বিষয়ে কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি, সেটি থেকে সাবধান থাকতে হবে।

আর দুনিয়াতে চলার ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে মতের বিরোধ হলে—মাথায় রাখবেন কুরআনে সব বিষয়ের সমাধান আছে, যেহেতু এটি পরিপূর্ণ। তাই, নিজেদের মধ্যে বিরোধ না রেখে, কুরআনের সমাধান মেনে নিতে হবে।

মোত্তাকি

- মোত্তাকিঃ যারা সদা সর্বদা সতর্ক হয়ে চলাফেরা করে নিজেদেরকে বা অন্য কোন কিছুকে সুরক্ষা দিয়ে চলে তাকে মোত্তাকি বলে। ইসলামি পরিভাষায়, যারা আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী জীবনযাপন করে তাদেরকে মোত্তাকি বলে।

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ও অভিধান প্রণেতা হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (মৃত্যু ৩৯৫ হিজরী) তার বিখ্যাত গ্রন্থ “মাকায়িস আল-লুগাহ” তে এই শব্দের সংজ্ঞাতে লিখেন:

ওয়াও," "ক্বাফ," এবং "ইয়া" থেকে গঠিত একটি শব্দমূল, যার অর্থ হল কোনো কিছু থেকে অন্য কিছু রক্ষা করা বা সুরক্ষা প্রদান করা। ।

اتَّقِ اللهَ

আত্তাকুল্লাহ এর অর্থ আল্লাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করা, যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার জন্য যা যা প্রতিরোধমূলক কাজ করা দরকার তাই করা। (শুধুমাত্র এক আল্লাহ্‌র আনুগত্য মেনে চলে নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা) [দেখতে পারেন Surah Al-Baqarah (2:278)]

নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ"

"আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করো, যদিও সেটা একটি খেজুরের টুকরো দিয়েও হয়।"

এখানে বোঝানো হয়েছে, আগুন থেকে বাঁচার জন্য যে যে প্রতিরক্ষামূলক কাজ করা দরকার সব কর, যদি এই ক্ষেত্রে খেজুরের টুকরোও কাজে লাগানো দরকার হয়, তবে তাকেও ব্যবহার করো।

আর "তাকওয়া" (التقوى):

তাকওয়া শব্দটি, যেটির অর্থ- নিজেকে রক্ষা বা সুরক্ষা দেয়ার জন্য একটি প্রতিরক্ষামূলক জীবন যাপন করা, এই ধারনার সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমনঃ বৃষ্টির দিনে পা পিছলে পরে যাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সবাই সতর্কতার সহিত পা ফেলে চলে। এটা হচ্ছে তাকওয়া।

আর যারা এইভাবে সাবধানে চলাফেরা করে তাদেরকে মোত্তাকি বলে। অর্থাৎ যে তাকওয়া অবলম্বন করে চলে তাকে মোত্তাকি বলে।

ইসলামি পরিভাষায়, জাহান্নাম থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সুরক্ষা বা প্রতিরক্ষা এবং এটিই সবচেয়ে বড় সফলতা।

আর, যারা আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী জীবনযাপন করে তাদেরকে মোত্তাকি বলে।

আবার, - সাহসী ব্যক্তিকে বোঝাতে "مُوَقًّى" বলা হয়েছে, যার মানে খুবই রক্ষিত বা সুরক্ষিত। অর্থাৎ সে নিজেকে সুরক্ষা দিতে পারে।

দলালা (সঠিক পথের বিপরীত পথ)

৪র্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইসমাইল ইবনু হাম্মাদ আল-জাওহারী (তাজ আল-লুগাহ ওয়া সিহাহ আল-আরাবিয়্যাহ) বলেন "الضَلالُ" এবং "الضَلالَةُ" অর্থ হলো সঠিক পথের বিপরীত। আমি ভুল পথে গিয়েছি (ضَلَلْتُ), এবং আল্লাহ বলেছেন: "আপনি যদি পথভ্রষ্ট হন, তবে তা আপনার নিজের জন্য।" (সূরা সাবা, আয়াত 50)

আরবিতে ভ্রষ্টতার প্রতিশব্দ হলো আদ-দলালা, যার অর্থ সঠিক পথের বিপরীত। এটি হেদায়েত বা গাইডেন্সের বিপরীত শব্দ।

মানুষের চলার পথে কোন নিয়ম-কানুন মানতে হবে তা আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

এখন যদি কেউ কোথায় কোথায় আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে তা না জানে, তাহলেও সে আদ-দলালা গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত।

قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ মূসা বলল, 'আমি এটি তখন করেছিলাম, যখন আমি ছিলাম সঠিক পথের বীপরিত পথে।' Ash-Shu'ara' 26:20

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ তাদের পথ, যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন। যাদের উপর (আপনার) ক্রোধ আপতিত হয়নি এবং যারা দলালাও নয়। Al-Fatihah 1:7

আমরা অনেকে মনে করি, যেহেতু জানলে মানতে হবে, তাই জানা যাবে না। এখন, আপনি যদি না জানেন তাহলে আপনি দলালা গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূল (স:) দলালা গ্রুপের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, খ্রিস্টানদের মধ্যে একটা গ্রুপ ছিল, যারা কিতাবে কী আছে জানতো না, কিন্তু মানার চেষ্টা করত। আজকের মুসলিম সমাজেও এ ধরনের অনেক মানুষ পাওয়া যায়,যারা সঠিক টা জানে না কিন্তু মানার চেষ্টা করে। আর মনে রাখবেন দলালা গ্রুপের স্থানও জাহান্নাম।

শয়তান

- শয়তান: শিন (ش), ত্ব (ط) এবং নুন (ن) নিয়ে গঠিত শব্দের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও সঠিক মূল আছে, যার অর্থ হলো দূরত্ব বোঝানো। মানুষকে যে তার উদ্দেশ্য বা অবস্থান থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, তাকে শয়তান বলে। ইসলামি পরিভাষায়, যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে চায় তাকে যে বা যারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে দূরে নিয়ে যায়, তাদেরকে শয়তান বলে।

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ও অভিধান প্রণেতা হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (মৃত্যু ৩৯৫ হিজরী) তার বিখ্যাত গ্রন্থ "মাকায়িস আল-লুগাহ" তে এই শব্দের সংজ্ঞাতে লিখেনঃ- শিন (ش), ত্ব (ط) এবং নুন (ن) নিয়ে গঠিত শব্দের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও সঠিক মূল আছে, যার অর্থ হলো দূরত্ব বোঝানো।

কুপের পানি যখন আমাদের হাতের নাগালের থেকে দূরে থাকত, তখন সুতা দিয়ে কূপের গভির থেকে পানি তোলা যায়। এই কারনে আরবরা সুতাকে শতন বলত। কারন, দড়ি দিয়ে একটা পাত্রকে দূরে নিয়ে, আপনার লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করা যায়। আবার সাপ দেখতে মোটা পাকানো সূতার মত, তাই সাপকে শয়তান বলত।

দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ, পৃথিবীর সর্বপ্রথম অভিধান প্রণেতা ও এরাবিক মাখরাজের জনক আল-খলিল (রহিমাহুল্লাহ) (১০০-১৭০ হি) তার বিখ্যাত অভিধান কিতাব আল-আইন এ বলেন:

الشَّطَنُ: এটি একটি দীর্ঘ এবং শক্ত দড়ি, যা সাধারণত পানি তোলার জন্য ব্যবহৃত হয়।

আল্লাহ বলেন-

طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ **الشَّيٰطِيْنِ**

এর ফল যেন **শয়তানের** মাথা;

(As-Saffat 37:65)

৪র্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ আবুল হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস[মৃত্যু ৩৯৫ হিজরী] বলেন,- এখানে শয়তান বলতে সাপকে বোঝানো হয়েছে, কারণ সাপকে শয়তান বলা হয়। আবার, প্রতিটি বিদ্রোহী জিন, মানুষ বা প্রাণীকে শয়তান বলা হয়।

তাহলে কুরানে বর্নীত শয়তান কারা-

৪র্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইসমাইল ইবনু হাম্মাদ আল-জাওহারী (তাজ আল-লুগাহ ওয়া সিহাহ আল-আরাবিয়্যাহ) বলেন, ইবন আল-সাকিত বলেছেন: যে মানুষকে তার উদ্দেশ্য বা অবস্থান থেকে দূরে সরিয়ে নেয়, সেই শয়তান।

আদম আঃ এর উদ্দেশ্য ছিল, তিনি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবেন। কিন্তু ইবলিশ আদম আঃ কে তার অবস্থান থেকে দূরে সরায় দিয়েছিল। এই কারনে আল্লাহ ইবলিশকে শয়তান বলেছে। ঠিক তেমনি ভাবে, আমি আপনি যদি মানুষকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে দূরে নিয়ে যাই তাহলে আমি আপনিও শয়তান। তাই বলা যায়,

শয়তান: শব্দটি দূরত্ব নির্দেশ করে। যারা বন্ধু সেজে এসে, ধোঁকা দিয়ে, আল্লাহর আনুগত্য লঙ্ঘন করায়/আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে নিয়ে যায় তাদেরকে শয়তান বলা হয়।

আল্লাহ বলেন শয়তান জীনদের থেকেও হতে পারে আবার মানুশদের থেকেও হতে পারে। যদিও মানুষজনের সবচেয়ে বড় ভুল ধারনা, তারা শুধুমাত্র ইবলিশকেই শয়তান মনে করে।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰي بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ؕ وَلَوْ شَاۤءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ

আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে। তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয় এবং তোমার রব যদি চাইতেন, তবে তারা তা করত না। সুতরাং তুমি তাদেরকে এবং তারা যে মিথ্যা রটায়, তা ত্যাগ কর।

(Al-An'am 6:112)

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট শয়তান জিন এবং মানুষ দুই গ্রুপ থেকেই হতে পারে। মিথ্যা কথা যে বলে তাকে আমরা মিথ্যাবাদী বলি।

তেমনিভাবে যে ধোঁকা দিয়ে মানুষকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে দূরে নিয়ে যায় তাকে শয়তান বলে।

বন্ধু সেজে এসে যে ধোঁকা মেরে মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, সেই শয়তান। শয়তান মানুষও হতে পারে আবার জিনও হতে পারে।

আদম আঃ ও তার স্ত্রীকে শয়তান জান্নাত থেকে সরালো কিভাবে? আল্লাহ বলতেছেন-

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ

এরপর শয়তান তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়।

(Al-Baqarah 2:36)

(এইখানে সরিয়ে দেয়া (আজাল্লা) বলতে যে শব্দটা ব্যবহার হয়েছে , এই শব্দের ধারনা হল-আমরা বর্ষাকালে অনেক সময় অনিচ্ছাকৃত মাটিতে স্লিপ বা পিচলা খেয়ে পড়ে যাই। আজাল্লা শব্দের অর্থ হল- পিচ্চিল খেয়ে সরে যাওয়া)

প্রশ্ন হল, কিভাবে সরিয়েছিল, জোরজবরদস্থি করে নাকি শত্রু সেজে?

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰۤاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰي شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰي

অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল। সে বলল, "আদম! আমি কি তোমাকে অমরত্বের বৃক্ষ ও অক্ষয় রাজ্যের সন্ধান দেব?"

(Ta Ha 20:120)

তাহলে বুঝা গেল শত্রু সেজে বা জোরজবরদস্থি করে, ইবলিশ আদম আঃ কে আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরায় নাই, বরং সে প্রথমে আদম আঃ এর শুভাকাঙ্খী হল কুমন্ত্রনা দিয়ে। তারপর সে আদম আঃ কে ধোকায় পালায়-

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ

وَقَاسَمَهُمَاۤ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ۙ

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ

তখন শয়তান তাদের আবৃত লজ্জাস্থান অনাবৃত করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয় আর বলে, "তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করেছেন কেবল এই কারণে যে, পাছে তোমরা ফেরেশতা অথবা (জান্নাতের) স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাও।"

সে তাদের কাছে শপথ করে বলল, "আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী।" এভাবে সে ধোঁকা দিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করল।

(Al-A'raf 7:20-22)

সে মূলত বন্ধু সেজে এসে আদম (আঃ) কে আল্লাহর আনুগত্য থেকে পদস্খলিত করল। এই ধোঁকা কারা দেয় কুরআনে আরো একজায়গায় বলেছে যেটা আমরা সবাই জানি-

الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

যে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয়, (এই কুমন্ত্রণা দাতা হতে পারে) জিন ও মানুষের মধ্য থেকে।

(An-Nas 114:5-6)

তাহলে এটা স্পষ্ট যে, শয়তান একটা বৈশিষ্টের নাম, যার কাছে এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান সেই শয়তান-

আবার নিম্নের আয়াতে আল্লাহ আরো স্পেসিপিক্যালি মানব শয়তানের কথা বলেছেন:

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَي الْجَمْعٰنِ ۙ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকে যারা পিছু হটে গিয়েছিল সেদিন, যেদিন দু'দল মুখোমুখি হয়েছিল, শয়তানই তাদের কিছু কৃতকর্মের ফলে তাদেরকে পদস্খলিত করেছিল। আর অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, সহনশীল।

(Aal-e-Imran 3:155)

এই আয়াতে আল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে শয়তান বলেছেন, কেননা সেদিন সে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে উহুদ যুদ্ধের ময়দান থেকে ৩০০ যোদ্ধাকে সরিয়ে নিয়েছিল।

আবার, আল্লাহ বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু।

(Al-Baqarah 2:208)

ইবলিসকে তো দেখা যায় না, তাহলে সে স্পষ্ট শত্রু হয় কীভাবে?

আসলে মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় শয়তান হলো মানুষ শয়তান। তারা বন্ধু, কখনো হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে এসে নানা রকম কুমন্ত্রণা ও ধোঁকা দিয়ে মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য করা থেকে দূরে নিয়ে যায়।

বর্তমান যুগের প্রকাশ্য শয়তান কারাঃ

শয়তান একটা বৈশিষ্ট্যের নাম, যার কাছে এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান সেই শয়তান। যারা বন্ধু বা শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে প্রতিভাত হয় কিন্তু আসলে মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। এই ধরনের ব্যক্তিরা তাদের সুস্থিরতা, আচরণ অথবা সামাজিক অবস্থান ব্যবহার করে মিথ্যা পথ দেখায়।

1. নামধারী ধর্মীয় আলেম, পীর সহ যারা জান্নাত সহ বিভিন্ন ধোঁকা দিয়ে মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে নিয়ে যায়।
2. রাজনৈতিক নেতা, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার, বা অন্য কোনো কর্তৃত্বপূর্ণ ব্যক্তি যাদের মধ্যে শয়তানি বৈশিষ্ট্যে আছে।
3. সরকার/পার্লামেন্ট এর কর্তা ব্যক্তিরা, যদি সে বা তআরা তার রাষ্ট্র শক্তি মানুষকে ধোঁকা দিয়ে আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে দূরে নিয়ে যায়।
4. শয়তান হতে পারেন আপনি নিজে, আপনার জীবন সঙ্গী, ভাই, বন বন্ধু বান্ধব সহ যে কেও যাদের মধ্যে শয়তানি বৈশিষ্ট্য আছে।

কিতাব

- আল্লাহ্‌র কিতাব : (كَتَبَ): এর মূল শব্দ তিনটি বর্ণের সংমিশ্রণ, যা কিছু জিনিস একত্রিত করার ধারণা প্রদান করে।, লিখিত তথ্য আকারে যেটা থাকে সেটাই কিতাব। কুরআনে আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে লিখিত দুই ধরনের কিতাবের কথা পাই।
  একটি হচ্ছে মূল কিতাব বা কিতাবের মা, যা আল্লাহর কাছেই সংরক্ষিত থাকে। যেখানে ইউনিভার্সালের সকল নিয়ম, আমাদের চোখের আড়ালের যত তথ্য, আমি আপনি সহ যে যা-ই করুক সব লিপিবদ্ধ হয়। তাই, এই কিতাবের লেখা চলমান আছে।অন্য ধরনটা হল আসমানি কিতাব**,** যেটা মূলত মূল কিতাবের অংশ। মানুষের জন্য গাইডেন্স হিসেবে যতটুকু দরকার, ততটুকু তথ্য আল্লাহ মূল কিতাব থেকে মানুষের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।
- কাতাবা আল্লাহঃ মানুষের ও জীনের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিকে পরিচালনা করার জন্য আল্লাহ মানুষের জন্য যে গাইডেন্স লিখে রেখেছেন সেটাই কাতাবা আল্লাহ।

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ও অভিধান প্রণেতা হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (মৃত্যু ৩৯৫ হিজরী) তার বিখ্যাত গ্রন্থ “মাকায়িস আল-লুগাহ” তে এই শব্দের সংজ্ঞাতে লিখেন (كَتَبَ): এর মূল শব্দ তিনটি বর্ণের সংমিশ্রণ, যা কিছু জিনিস একত্রিত করার ধারণা প্রদান করে। এর মধ্যে **الكِتَابُ**এবং **الْكِتَابَةُ**অন্তর্ভুক্ত। বলা হয়: "আমি বই লিখেছি" বা "আমি বই লিখি।" তারা বলেন: "আমরা দুইটি শিং একত্রিত করেছি", একটি রিং দিয়ে।
সেলাই করা কোনো কিছুকেও **الْكُتْبَةُ**বলা হয়, কারণ একের অধিক অংশকে সেলাই করে একত্রিত করা হয়।
বইকেও **الكِتاب**(কিতাব) বলা যায়, কেননা সেখানেও অনেক তথ্য একত্রিত থাকে।
এবং এই মূল থেকে এসেছে **كَتَائِبُ الْخَيْلِ**(যুদ্ধের দল)। বলা হয়: "তারা সংগঠিত হয়েছে।" কেউ বলেছেন: "এক হাজার সৈন্যের একটি দল সংগঠিত হয়েছে/একত্রিত হয়েছে।"
কুরআনে আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে লিখিত দুই ধরনের কিতাবের কথা পাই।
একটি হচ্ছে মূল কিতাব বা কিতাবের মা, যা আল্লাহর কাছেই সংরক্ষিত থাকে। যেখানে ইউনিভার্সালের সকল নিয়ম, আমাদের চোখের আড়ালের যত তথ্য, আমি আপনি সহ যে যা-ই করুক সব লিপিবদ্ধ হয়। তাই, এই কিতাবের লেখা চলমান আছে।

অন্য ধরনটা হল আসমানি কিতাব**,** যেটা মূলত মূল কিতাবের অংশ। মানুষের জন্য গাইডেন্স হিসেবে যতটুকু দরকার, ততটুকু তথ্য আল্লাহ মূল কিতাব থেকে মানুষের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাই, কুরআনে আপনি ফেরাউন ও তার সভাসদদের কথোপকথন, অতীতের ইতিহাস পাবেন, কারণ তখন তারা যা করেছিল বা বলেছিল সব লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল মূল কিতাবে। এর মধ্যে মানুষের জন্য গাইডেন্স হিসেবে যতটুকু কথোপকথন দরকার, তা আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে।
এই কিতাব সম্পর্কে জ্ঞান রাখা গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ বলেন: **مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ**"তুমি (মুহাম্মদ (সা:)) জানতে না 'আল কিতাব কী' এবং ঈমান কী?"
[আল-কুরআন, আশ-শূরা 42:52]

ঈমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস, কিতাব শব্দের অর্থ বই, এটা তো প্রত্যেক আরবের জানার কথা। তাহলে আল্লাহ কেন বলছেন যে তিনি জানতেন না?

আপনি কি জানেন—কিতাব কী?

قَالَتۡ یٰۤاَیُّهَا الۡمَلَؤُا اِنِّیۡۤ اُلۡقِیَ اِلَیَّ کِتٰبٌ کَرِیۡمٌ
সে (রাণী) বলল, 'হে পারিষদবর্গ! নিশ্চয় আমাকে এক সম্মানজনক কিতাব (পত্র) দেয়া হয়েছে।'
[আন-নামল 27:29]

উপরের সংজ্ঞা এবং এই আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, লিখিত তথ্য আকারে যেটা থাকে সেটাই কিতাব। এটি হতে পারে আল্লাহর কিতাব কিংবা মানুষের তৈরি কিতাব।

কিতাবের জ্ঞান না থাকার জন্য ইসলাম সম্পর্কে আমাদের মাঝে অনেক ভুল ধারণা কাজ করে, এবং কিছু অনুবাদকদের অনুবাদে বিকৃতি আসে।

আমরা প্রথমে উপরে বর্ণিত দুই ধরনের কিতাব নিয়ে আলোচনা করি—

মূল কিতাব বা কিতাবের মা

কুরআনের শুরুতে, সূরা বাকারা ২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলছেন: ذٰلِكَ الۡکِتٰبُ لَا رَیۡبَ فِیۡهِ هُدًی لِّلۡمُتَّقِیۡنَ
"ঐ কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, আছে মোত্তাকীদের (অন্যায় পরিহারকারী, আল্লাহভীরু, সৎকর্মশীল ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের) জন্য পথনির্দেশ;"
[আল-বাকারা 2:2]

এখানে আল্লাহ "হাজাল কিতাব" (এই কিতাব) না বলে, "জালিকাল কিতাব" (ঐ কিতাব) বলেছেন, যা মূল কিতাব বা কিতাবের মা বোঝায়। এটি আল্লাহ কর্তৃক লিখিত, যা আল্লাহর কাছেই আছে। এখান থেকেই আল্লাহ কুরআন নাজিল করেছেন, যতটুকু মানুষের গাইডেন্স হিসাবে দরকার।

কুরআনের ক্ষেত্রে আল্লাহ "হাজাল কুরআন" ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ কাছের এই কুরআন।

যে মূল কিতাবের অংশ কুরআন, সে কিতাবের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে আলোচনা করা হল:

১. এটি হচ্ছে মূল কিতাব:
আল্লাহ বলেন: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ
"আল্লাহ যা ইচ্ছা মুছে দেন এবং যা ইচ্ছা স্থির রাখেন, আর মূল কিতাবটি তাঁর নিকটেই রয়েছে।"
[সূরা আর-রাদ 13:39]

মূল কিতাব আল্লাহর কাছে আছে, কিন্তু প্রশ্ন হল, আল্লাহ কি মুছে দেন? আসুন কুরআনকে জিজ্ঞাসা করি—

আল্লাহ বলেন:

"إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍۢ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا"
"যারা তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের মন্দ কাজগুলোকে সৎকাজে পরিবর্তন করে দেন। আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"
[সূরা আল-ফুরকান 25:70]

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের পূর্বের গুনাহগুলোকে মুছে দেন এবং তা সৎকাজে পরিণত করে দেন। আর অনেকে নিজের মত ব্যাখ্যা দিয়ে বলে, আমি যে খারাপ কাজটা করব, সেটা লিখে দেওয়া হয় ভালো কাজের পরিবর্তে অথবা বিপরীত। অথচ এ রকম কোনো আয়াতের রেফারেন্স কুরআনে নেই।

২. আসমান ও যমীনে কোনো গোপন বিষয় নেই যা এই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই:

"وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ"
"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কোনো গায়েবের (গোপন) বিষয় নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই।"
[সূরা আন-নামল 27:75]

এখন, প্রশ্ন হচ্ছে গায়েবের খবর বা গোপন বিষয় কোনগুলো—
আল-খলিল রহিমাহুল্লাহ বলেন— গায়েব শব্দটি দিয়ে বুঝায় এমন কিছু যা চোখ থেকে আড়ালে থাকে।
যেমন আল্লাহ বলেন:
"قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ"
তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, 'তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না, আর যদি কিছু করই, তাহলে তাকে কোন কূপের (গায়েবে) গভীরে ফেলে দাও, যাত্রীদলের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে'।
[সূরা ইউসুফ 12:10]

এই গায়েব শব্দটি ফোকাসে আনা হয়েছে কারণ অনেকে এই আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করেন, যেমন তারা বলেন, আমি যদি খারাপ কাজ করি, তা আল্লাহ আগে থেকে লিখে রেখেছেন বলেই করি। মানুষকে যে আল্লাহ ভালো ও খারাপ কাজের ব্যাপারে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছেন, সেটি তারা অস্বীকার করে সব খারাপ কাজের দোষ আল্লাহর ওপর চাপিয়ে দেয়, নাউজুবিল্লাহ।

কুরআনের প্রতি আয়াতের একাধিক রেফারেন্স আয়াত থাকে, তাই আপনি এক আয়াত দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অন্যান্য রেফারেন্স আয়াতের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে, আপনি ভুল বুঝছেন কিনা। এখানে মূলত সেই গায়েবের কথা বলা হয়েছে, যেটি আমার আপনার চক্ষুর আড়াল। যেমন আজ থেকে ৫০০ বছর আগে কোথায় কী হয়েছে আপনি জানেন না, সমুদ্রে গভীরে কোনো পয়েন্টে এখন কী হচ্ছে আপনি জানেন না, কেয়ামত কবে হবে আপনি জানেন না— এই ধরনের অনেক বিষয় আছে যেগুলি আপনি জানেন না। এগুলো গায়েবের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ বলেন:

" وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ"

"আর তাঁর কাছে রয়েছে গায়বের চাবি, তা কেউ জানে না, তিনি জানেন স্থলে এবং সাগরে যা আছে। এমন কোনো পাতা ঝরে না, যা তিনি জানেন না এবং মাটির অন্ধকারে কোনো বীজ কিংবা আর্দ্র বা শুষ্ক কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।" [সূরা আল-আনআম 6:59]

গাছের পাতা ঝরলেও তা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ হচ্ছে। অর্থাৎ, যখন যাই ঘটুক, কোনো কিছুই আল্লাহর জ্ঞানের বাহিরে নয়। ভালো বা মন্দ যাই ঘটুক না কেন, সব লিপিবদ্ধ হচ্ছে, অর্থাৎ এই কিতাবের লেখা চলমান আছে।

মানুষ বলে যে তারা খারাপ কাজ করছে কারণ আল্লাহ তা লিখে রেখেছেন বলেই সে করেছে, কুরআনের আলোকে তা সঠিক নয়।
একটি গ্রুপ বলে, যেমন নাচানো হয়, তেমনি নাচি, পুতুলের কী দোষ— তারা সকল অপকর্মের দোষ আল্লাহর উপর দিয়ে দেয়। মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে কি কি খারাপ কাজ করবে ,তা আল্লাহ আগে লিখে রাখছেন এর কোন প্রমান কুরআনে নাই।

কুরআন তো অনেক বড়, এই কথা কেন আল্লাহ লিখলেন না, কিন্তু আপনি আপনার মনমতো ব্যাখ্যা টেনে এই কথা বলে বেড়াচ্ছেন। কে আপনাকে আল্লাহ যা বলেননি তা আগ বাড়িয়ে বলার অনুমোদন দিয়েছে?

কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা (ফ্রি উইল) দেওয়া হয়েছে এবং তারা তাদের কর্মের জন্য দায়ী। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন এবং তাদের ইচ্ছার ভিত্তিতে সৎকর্ম বা পাপকর্ম করার স্বাধীনতা দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন:

"وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ"
"আর বলে দাও, সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে; এখন যে ইচ্ছা করে, সে বিশ্বাস স্থাপন করুক, আর যে ইচ্ছা করে, সে অবিশ্বাস করুক।"
[সূরা আল-কাহফ 18:29]

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, মানুষকে সঠিক পথ দেখানো হয়েছে, কিন্তু সে কোন পথে চলবে তা তার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ কাউকে বাধ্য করেন না যে সে খারাপ কাজ করুক।

এছাড়াও, অন্য একটি আয়াত:

"إِنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا" "নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি মানবজাতির জন্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি সত্যসহ। সুতরাং যে ব্যক্তি সঠিক পথে চলে, সে নিজের জন্যই সঠিক পথে চলে। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়, সে নিজের বিরুদ্ধেই পথভ্রষ্ট হয়।" Surah Az-Zumar (39:41):

এই আয়াতগুলো ইঙ্গিত দেয় যে মানুষ স্বাধীন ইচ্ছা নিয়ে কাজ করে এবং তাদের নিজস্ব কর্মের জন্য দায়ী।

আল্লাহ্‌র কাছে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ নাই। মহাকাশে সময় নামে কোন ডাইমেনশন নাই। আল্লাহ্‌র জ্ঞান অনাদি অনন্ত। আমি আপনি আল্লাহ্‌র জ্ঞান ততটুকুই জানি যতটুকু আল্লাহ বলেছেন।

আল্লাহ কোথাও বলেননি যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে ভালো না খারাপ কাজ করবে আল্লাহ তা আগে থেকে মূল কিতাবে লিখে রেখেছে। বরং আল্লাহ বলছেন- *"هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ" "এটাই আমাদের কিতাব, যা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য বলছে। আমরা তোমরা যা কিছু করছিলে তা লিপিবদ্ধ করে রাখছিলাম।"* Surah Al-Jathiyah (45:29)

আমরা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে যা করতাম, আল্লাহ তা লিখে রাখতেন, এবং এই রেকর্ড দিয়ে আমাদের বিচার হবে।

৩. যেখানে গাইডেন্স আছে মানব জাতির জন্য: এই যে মূল কিতাব, সেখানে সকল সৃষ্টির জন্য গাইডেন্স আছে এবং মানুষের জন্যও আছে। আল্লাহ বলেন- *"ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ"* "ঐ কিতাব, এতে কোনো সন্দেহ নেই, এটি মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শক।" Surah Al-Baqarah (2:2):

এখন আসা যাক, দুনিয়াতে মানব জাতির জন্য গাইডেন্স আকারে পাঠানো কিতাব কোনগুলি: মূল কিতাবে মহাজগতে সব কিছুই লিপিবদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু এর সব কিছু তো মানব জাতির জন্য দরকার নাই। যতটুকু গাইডেন্স মানব জাতির জন্য দরকার, ততটুকু আল্লাহ এই মূল কিতাব থেকে মানুষের জন্য পাঠিয়েছেন। যেমন ধরুন: গাছের জন্য যে গাইডেন্স, সেটা দিয়ে মানুষ কি করবে। আল্লাহ মানবজাতির গাইডেন্স এর জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকু তাওরাত, যবূর, ইঞ্জিল, আল-কুরআন সহ বিভিন্ন কিতাবের মাধ্যমে মানব জাতির জন্য পাঠিয়েছেন।

বুঝা গেল, মূল কিতাব আমাদের কাছে নাই, তা আছে আল্লাহর কাছে।

এখন, কুরআন আর মূল কিতাবের মধ্যে পার্থক্য কি?

আসমানী কিতাবগুলো মানব জাতির জন্য গাইডেন্স। এবং সকল নবীর দাওয়াত ছিল এক—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তাই যদি আমরা কুরআন নিয়ে আলোচনা করি, তাহলে অন্য কিতাবগুলোও আসবে।

আল্লাহ বলেন- " شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰي بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰي وَعِيْسٰٓي اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۗ كَبُرَ عَلَي الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ۗ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاۗءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ" "তিনি তোমাদের জন্য দীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি নূহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হল, তোমরা দীন কায়েম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না। তুমি মুশরিকদেরকে যেদিকে আহবান করছ তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়; আল্লাহ যাকে চান তার দিকে নিয়ে আসেন। আর যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে তিনি হিদায়াত দান করেন।" Ash-Shura 42:13

দ্বীন সবসময় এক ছিল এবং মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি কিভাবে পরিচালিত হওয়া দরকার তা আল্লাহ কিতাবে লিখে রেখেছেন। কিতাবে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের বিষয়সমূহ আল্লাহ আগে থেকে লিখে রেখেছেন, এইটাই কিতাবুল্লাহ। এইটার মানে এই না যে, আপনি আজকে জেনা করবেন, এটা আল্লাহ আগে লিখে রেখেছে বলেই আপনি জেনা করবেন। এই ব্যাপারটায়

আপনি স্বাধীন, কিন্তু এই ব্যাপারে শাস্তির বিধান আল্লাহ আগে থেকেই লিখে রেখেছেন। আর, আপনি জেনা করলে এটা আল্লাহ তার কিতাবে লিপিবদ্ধ করবেন, যেমনটা জেনা করার পর।

আল্লাহ কুরআনে বলেন- *"هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحۡمَةٌ لِّقَوۡمٍ يُّوۡقِنُوۡنَ" "এ* কুরআন মানবজাতির জন্য পথনির্দেশ এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও রহমত।" Al-Jathiyah 45:20

আল্লাহ আরো বলেন- *"وَكَذٰلِكَ اَنۡزَلۡنٰهُ قُرۡاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفۡنَا فِيۡهِ مِنَ الۡوَعِيۡدِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُوۡنَ اَوۡ يُحۡدِثُ لَهُمۡ ذِكۡرًا" "আর এভাবেই আমি আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি এবং তাতে বিভিন্ন সতর্কবাণী বর্ণনা করেছি, যাতে তারা মুত্তাকী হতে পারে অথবা তা তাদের জন্য উপদেশ।"* Ta Ha 20:113

তিনি আরো বলেন- *"كِتٰبٌ فُصِّلَتۡ اٰيٰتُهٗ قُرۡاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوۡمٍ يَّعۡلَمُوۡنَ" "এমন এক কিতাব, যার আয়াতগুলো জ্ঞানী কওমের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কুরআনরূপে আরবী ভাষায়।"* Fussilat 41:3

তাহলে বুঝা গেল, কুরআন স্পষ্ট এবং মানব জাতির জন্য গাইডেন্স আছে। আর মূল কিতাবও স্পষ্ট, কিন্তু সেখানে সকল কিছুর গাইডেন্স এবং রেকর্ড আছে যা চলমান।

তাহলে কুরআন ও মূল কিতাবের মধ্যে মিল কোথায়: *"طٰسٓ ۚ تِلۡكَ اٰيٰتُ الۡقُرۡاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيۡنٍ"* "ত্ব-সীন; এগুলো আল-কুরআন ও সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।" *An-Naml 27:1*

কুরআনে যা আছে সবই মূল কিতাবে আছে, যেহেতু মূল কিতাব হল মা, কিন্তু মূল কিতাবের সবকিছু কুরআনে নাই। কিন্তু দুটোই সুস্পষ্ট।

তাই কুরআনের ক্ষেত্রে আল্লাহ বলেন: হাজাল কুরআন/ এই (নিকটের) কুরআন, আর অন্যদিকে আল-কিতাবের ক্ষেত্রে বলা হয় জালিকা আল-কিতাব/ ঐ(দূরের) কিতাবটি।

দুনিয়াতে আপনাকে কিভাবে চলতে হবে তার ম্যানুয়াল হল এই কিতাব, যেটার আল্লাহ নাম দিয়েছেন কুরআন। আল্লাহ জ্ঞান অনাদি অনন্ত। আল্লাহ গায়েব/ যা গোপন করা আছে সব জানেন। কিন্তু মানুষের জ্ঞান সীমিত। সে প্রশ্নও করে তার সীমিত জ্ঞান থেকে। আমরা বলি, যার বুঝ যতটুকু, তার প্রশ্ন করার লেভেলও ততটুকু।

তাই, মানুষের উচিত নয়, আল্লাহ সম্পর্কে এমন ধারণা প্রতিষ্ঠা করা, যা আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে বলেননি। উদাহরণস্বরূপ, আপনি বললেন- আল্লাহ সব করতে পারেন। শুনতে খুব ভালো শোনাচ্ছে। আপনি আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা করছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে - আল্লাহ কি সব করতে পারেন? আল্লাহ কি মিথ্যা বলতে পারেন? আল্লাহ কি বিয়ে করতে পারেন? নাউজুবিল্লাহ।

এইগুলো কোনটাই আল্লাহর ইজ্জতের সাথে যায় না। আল্লাহ সব করতে পারেন এমন কথা কুরআনে নাই।

ঠিক তেমনিভাবে, আমাদের সীমিত জ্ঞান দিয়ে আল্লাহ সম্পর্কে এমন মন্তব্য করা উচিত না, যা কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি। মানুষ তার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই চিন্তা করতে পারে, এর বাইরে সে চিন্তা করতে পারে না। যেমন: কেউ যদি পাথরকুচি গাছ না দেখে, তাহলে পাতা থেকে গাছের চারা জন্ম নেয়, এটা মানুষকে বিশ্বাস করাতে পারবেন না।

তাই, আল্লাহ যতটুকু তার সম্পর্কে জানিয়েছে, তার বাইরে আমাদের একটুও বেশি অথবা কম বলা উচিত নয়।

উপরিউক্ত আয়াতগুলো থেকে সহজেই বোঝা যায়, আল্লাহ্‌র কিতাবে আল্লাহ মানুষের গাইডেন্সসহ গোপনীয় সব কিছু লিপিবদ্ধ আছে। আবার, এই কিতাবের লেখা কিন্তু শেষ হয়নি, এখনো লেখা চলমান।

"هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ" "এটা আমাদের কিতাব, যা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য বলছে। আমরা তোমরা যা কিছু করছিলে তা লিপিবদ্ধ করে রাখছিলাম।"

একবার এক মুসলিম ভাই এসে বলল- ভাই আমি কতবার যিনা করব, এটাও পূর্ব নির্ধারিত। তিনি আমাদেরকে সহিহ মুসলিম ২৬৫৮ হাদিসসহ আরো বেশকিছু হাদিসের রেফারেন্স দেখালেন। বললাম, আরবি দেখুন, সেখানে "কাতাবা" লেখা, তাকদীর নয়। আবার, মানুষ জেনার মতো খারাপ কাজ করতে পারে, কারণ আল্লাহ তাকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন, যা ব্যবহার করে সে তার সাধ্যের মধ্যে ভালো ও খারাপ দুইটাই করতে পারে। এই জন্য আল্লাহ তার বিচার করবেন। কিন্তু ফেরেস্তা এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি যে, তাদের দুঃখ-কষ্ট থাকবে, তাদের ভালো-মন্দ যাচাই করে কাজ করার চয়েস থাকবে।

যিনার ব্যাপারে আল্লাহর বিধান কী? মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করে যিনার মতো খারাপ কাজ করতে পারে কিনা, এটা আল্লাহ ৫০ হাজার বছর কেন আরো আগে লিখে রাখলে কোন সমস্যা হয় না, কিন্তু এটা সমস্যা করবে তখনই যদি আপনি অনুবাদ করেন যে আল্লাহ অনেক আগেই লিখে রেখেছেন কে, কখন, কার সাথে যিনা করবে, এবং আল্লাহ লিখে রেখেছেন বলেই সে যিনা করে। কেননা, আপনি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলছেন।

তাই, আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা জরুরি। আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় সমাজে কিছু কমন কথা বিরাজ করে: ১। সব কিছু যদি আগে থেকেই নির্ধারিত থাকে, তাহলে দুনিয়াটা একটা বানানো নাটক হয়ে যাবে। ২। আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন বলেই আমরা নাস্তিক। ৩। সব কিছু যদি আগে থেকেই নির্ধারিত থাকে, তাহলে বিয়ে করার আগে মেয়ে দেখার দরকার কি? হুজুররা কেন মেয়ে দেখে? (ওরা হাসাহাসি করে বলত যে, হুজুর নিজেই তাকদীরের উপর বিশ্বাস করে না!!?) ৪। আল্লাহ জান্নাত ও জাহান্নাম রাখলেনই বা কেন? এটাতো পক্ষপাতমূলক হয়ে গেল না? ৫। কখনো এক থাপ্পড় দিয়ে বলত, তোর তাকদিরে লেখা ছিল মামা, এইটা।

দুনিয়াতে আপনি কিভাবে চলবেন, কার আনুগত্য করবেন, কাকে (কি বৈশিষ্ট্য দেখে) বিয়ে করবেন, কিভাবে বিচার করবেন, এসব সবই "কাতাবুল্লাহ", অর্থাৎ আল্লাহ কুরআনে সব কিছুর জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম লিখে দিয়েছেন।

মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে কিভাবে পরিচালিত করবে আল্লাহ তা লিখে রেখেছেন কুরআনে। কিন্তু আমরা এটাকে ভাগ্য বলে চালিয়ে দিই, যা কুরআনের স্পষ্ট বিকৃতি। এটা আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত - তিনি মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন, কিন্তু এই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সে ভালো কাজ করবে, নাকি মন্দ কাজ করবে, এটা তার ব্যাপার। ভালো কাজ কিভাবে করবে, আর মন্দ করলে কি শাস্তি দিবে তা কিতাবে (কুরআনে) লেখা আছে।

আর, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নিয়ে নির্দেশনা আছে কিতাবে, অর্থাৎ কুরআনে। আর, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে যে কাজ করে, সেটার জন্য তার বিচার হবে।

তাকদীর

- তাকদীর : “কদর (قدر): আল কদর অর্থ সফল নিয়ম/সঠিক সিদ্ধান্ত।“ এ বিশ্বের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আল্লাহ প্রতিটি সৃষ্টির জন্য যে সুশৃঙ্খল নিয়ম, কার্যপ্রণালী বা ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাকেই তাকদীর বলা হয়। যেমন : সূর্য পূর্ব দিকে উঠে, এটা তাকদীর। কেও চাইলেও তাকে পশ্চিম দিক থেকে উঠাতে পারবেন না তাকদীরে বিশ্বাস মানুষকে বাস্তববাদী করে তুলে।

দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ, পৃথিবীর সর্বপ্রথম অভিধান প্রণেতা ও এরাবিক মাখরাজের জনক আল-খলিল (রহিমাহুল্লাহ) (১০০-১৭০ হি) তার বিখ্যাত অভিধান কিতাব আল-আইন এ বলেন:

القَدَرُ: القضاء الموفق
“কদর (قدر): আল কদর অর্থ সফল নিয়ম/সঠিক সিদ্ধান্ত।“

আর, আল্লাহ বলেন:

اِنَّا كُلَّ شَیۡءٍ خَلَقۡنٰهُ بِقَدَرٍ
নিশ্চয় আমি সব কিছু একটি নির্ধারিত নিয়মে সৃষ্টি করেছি।
Al-Qamar 54:49

আবার, [ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *কুরআন- সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকিদা,* পৃ.৩৭৮-৩৭৯] তিনি বলেন:

এ বিশ্বের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আল্লাহ প্রতিটি সৃষ্টির জন্য যে সুশৃঙ্খল নিয়ম, কার্যপ্রণালী বা ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাকেই তাকদীর বলা হয়। তাকদীরে বিশ্বাস করা মানে হল- আল্লাহ এই দুনিয়ার কোন কিছু অনিয়মে সৃষ্টি করেননি। চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র—আমাদের সবকিছুই একটা নির্দিষ্ট নিয়মে সৃষ্টি করেছেন। এই নিয়মে যেমন চন্দ্র ও সূর্য তার কক্ষপথে ঘুরছে, তেমনি দিনের পর রাত আসবে, সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসবে, গোখরা সাপের মধ্যে বিষ থাকবে, আম গাছ থেকে পড়লে মাটিতে পড়বে, আকাশে যাবে না, এই নিয়মে সূর্য ওঠা রয়েছে, এই নিয়মে বৃষ্টি পড়া রয়েছে, এই নিয়মে বিষ খেলে মানুষ মারা যাবে, এই নিয়মে আপনার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে মারা যাওয়া রয়েছে, এই নিয়মে চুরি করলে কি শাস্তি হওয়া উচিত তা রয়েছে।

তাকদীরে বিশ্বাস মানুষকে আজগুবি কাজ-কর্ম থেকে দূরে রাখে। সে ১০ তালা বিল্ডিং থেকে লাফ দিবে না, কেননা লাফ দিলে সে হয়তো মারা যাবে অথবা মারাত্মক আহত হবে, এটা সে জানে। অর্থাৎ, আল্লাহর কদর হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম।

তাই আল-খলিল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

"إذا وافق الشيء شيئاً قيل: جاء على قَدَره، يقال: قَدره الله تقديراً"
"আল্লাহর একটি নিয়ম/কদর অনুযায়ী, যখন অন্য একটি জিনিস/কাজ/আইডিয়া মিলে যায় তখন সেটাকে তাকদীর বলে। অর্থাৎ যখন একটা জিনিস/কাজ/আইডিয়া, অন্য আরেকটা জিনিস/কাজ/আইডিয়া এর সাথে মিলে যায়, তখন বলা হয় এটা একটি নির্দিষ্ট নিয়ম/কদর অনুযায়ী হয়েছে।"

আল্লাহ বলেন:

وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ
আর সূর্য তার নির্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করে। এটা মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)-এর নির্ধারণ/তাকদীর।
ইয়াসিন ৩৬: ৩৮

সূর্য তার কক্ষপথে ঘুরবে, এটা তার নিয়ম/কদর। আবার, সূর্য ও চন্দ্রকে এমন নিয়মে/কদরে আল্লাহ বানিয়েছেন, তা থেকে মানুষ সময় নিরূপণ করতে পারবে।

Al-An'am 6:96
فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ
(তিনি) প্রভাত উদ্ভাসক। তিনি বানিয়েছেন রাতকে প্রশান্তি এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সময় নিরূপক। এটা সর্বজ্ঞ পরাক্রমশালীর নির্ধারণ/তাকদীর।

আরেকটি বিষয় হল, তাকদীরে বিশ্বাস কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে বুঝায়, আল্লাহ তাআলার এলেম অনাদি অনন্ত। তিনি তার অনাদি অনন্ত এলেমের কারণে, সৃষ্টির আগে থেকেই জানেন কোন জিনিস কোন নিয়মে চলবে, কি করলে দুনিয়াতে শান্তি আসবে, মানুষ কিভাবে কি করলে সফলতা আসবে, এই সকল বিষয় তিনি অনেক আগে থেকেই জানেন।

আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন-

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۙ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا

কসম নাফ্সের এবং যিনি তা সুসম করেছেন। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন,

Ash-shams 91:7-8

নাফসের অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান আছে, তাই নাফসের এই বৈশিষ্ট্য হল আল্লাহ্র তাকদীর। আবার আল্লাহ বলেন-

وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۚ
আমি তাকে (ভাল ও মন্দ) দুটি পথ দেখিয়েছি।
Al-Balad 90:10

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ
বল, "সত্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে (এসেছে)। অতএব, যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক আর যার ইচ্ছা অবিশ্বাস করুক।"
Al-Kahf 18:29

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا
আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি; এখন (তার ইচ্ছায়) হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় অকৃতজ্ঞ হবে।
Al-Insan 76:3

আরও পাবেন: [বাকারা ২:২৫৬, আশ-শামস ৯১:৭-১০]

আবার আল্লাহ বলেন:
"আর প্রত্যেক মানুষের কাজের জন্য সে নিজেই দায়ী।"
— সূরা আল-মুদ্দাসসির ৭৪:৩৮
অর্থাৎ, এই নিয়মের মধ্যে আছে মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি কোন দিকে পরিচালিত করবে।

আর, আল্লাহর এই নিয়মসমূহ আল্লাহ্‌র কিতাবে/কুরানে লেখা আছে।

আল্লাহ মানুষকে বলেন:
"যারা (আল্লাহর) জন্য প্রচেষ্টা চালায়, আমি অবশ্যই তাদের আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।"
— *সূরা আনকাবুত ২৯: ৬৯*

এটা আল্লাহর নিয়ম, আল্লাহ আপনার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিতে হস্তক্ষেপ করবেন না, কিন্তু আপনি যদি আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা চালান সেক্ষেত্রে আল্লাহ আপনাকে সহযোগিতা করবেন, এটা আল্লাহর নিয়ম/কদর।

এছাড়াও, আল্লাহ বলেছেন:
"আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"
— *সূরা আল-ইমরান ৩: ১৪৬*

এখানে ধৈর্যের সাথে প্রচেষ্টা চালালে, আল্লাহ আপনার সাথে থাকবেন এবং সাহায্য করবেন। এটা আল্লাহর কদর/নিয়ম। আরও নিয়ম/কদর পাবেন:

"হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য করো, তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ় রাখবেন।"
— *সূরা মুহাম্মদ, ৪৭: ৭*

এখন যদি কেউ আল্লাহকে সাহায্য না করে, তাকে সাহায্য করা আল্লাহর নিয়মের মধ্যে নেই।

আবার, আল্লাহ বলতেছেন, শুধু ইমান আনলে কাওকে ক্ষমতা দিবেন না, কিন্তু আপনি যদি কুরানে যা যা বলছে সে অনুসারে প্র্যাক্টিকেল কাজ বাস্তবায়ন করেন আল্লাহ সে সকল মুমিনদের ক্ষমতা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি

অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই ফাসিক।

An-Nur 24:55

এখন যদি, আল্লাহ যা যা করতে বলেছেন, সে অনুসারে কাজ করেন তাহলে ক্ষমতা আপনাকে আল্লাহ দিবে, এটা তাকদীর।

আবার, আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
আর যারা ঈমান রাখে ও সৎকাজ করে তারা জান্নাতের অধিবাসী হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।
— Al-Baqarah 2:82

কে জান্নাতে যাবে তার তাকদির/নিয়ম আল্লাহ আগেই ঠিক করে রেখেছেন। এখন কেউ যদি আল্লাহর এই নিয়ম/কদর অনুসারে চলে, অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য মেনে চলে, সে জান্নাতে যাবে। এটা হল তাকদীর।

আবার:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
কিন্তু যারা (তা মেনে চলতে) অস্বীকার করবে এবং আমার প্রমাণসমূহকে মিথ্যা বলবে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।
— Al-Baqarah 2:39

আর এই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করে যারা কুফরি করবে, আল্লাহর কদর/নিয়ম অনুসারে তাদের তাকদীর হবে জাহান্নাম।

তাকদীরের বিশ্বাসকে বুঝতে হলে, আমাদেরকে তাকদীরের যারা পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীদের জীবনী দেখতে হবে।

আল্লাহ বলেন:

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ
তাদের সাথে যুদ্ধ করো; যাতে আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করতে পারেন, তোমাদেরকে তাদের ওপর বিজয়ী করতে পারেন, মুমিনদের বুক শান্ত করতে পারেন।
— At-Taubah 9:14

তাহলে যুদ্ধ করলেই বলছে আল্লাহ বিজয় দিবে, এটা তাকদীর যেটা আল্লাহ আগে থেকে বলে দিয়েছেন। এখন, এই তাকদীরের বাস্তবায়নের সর্বোচ্চ আদর্শ হচ্ছেন রাসূল সাঃ। তিনি তা কিভাবে করেছেন—

যুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য কুরআনে যত গাইডেন্স আছে, সব নিয়মকেই বিবেচনায় রেখে তিনি যুদ্ধ করতেন।
তার গোয়েন্দা বাহিনী ছিল (*তাওবা ৯: ১২২*), তার গুপ্তচর ছিল (*আব্বাস রাঃ*), তিনি পরামর্শ করতেন (*আল ইমরান ৩: ১৫৯*), তিনি এমনভাবে যুদ্ধের পরিকল্পনা সাজাতেন যাতে শত্রু পক্ষের শক্তি রাসূলের মোকাবেলায় কাজ না করে অথবা এমন কৌশল করতেন যাতে করে শত্রুর শক্তিকে দুর্বল করে রাখা যায়।

১. মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার সময় তিনি মদিনায় যে পথে সবাই যায়, সেই দিকে না গিয়ে উল্টো দিকে চলে গিয়েছিলেন, যাতে শত্রুদের ধোঁকা দেওয়া যায়।
২. খন্দকের যুদ্ধে মদিনার তিন পাশে পরিখা খনন করে দেন, যাতে শত্রু তার যুদ্ধ সরঞ্জাম নিয়ে মদিনায় প্রবেশ করতে না পারে।
৩. বদরের যুদ্ধে আগে গিয়ে বদরের প্রান্তর দখলে নিয়ে, পানির কূপগুলো ধ্বংস করে দেন, যাতে তারা পিপাসায় দুর্বল হয়ে পড়ে।

এখন চিন্তা করুন, আল্লাহ তো তাকদীর বলেই দিয়েছিলেন, তাহলে এত কৌশলের দরকার কী? আমরা তাকদীরের সঠিক অর্থ না বুঝতে পারায় তাকদীর যেখানে আমাদেরকে বাস্তববাদী করে তোলার কথা, সেখানে আমরা আবেগী ও অবাস্তববাদী হয়ে যাচ্ছি।

একটা জিনিস লক্ষ্য করুন, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ আগে থেকেই জানিয়েছিলেন আপনাকে আমি বিজয় দিব।

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
নিশ্চয় যিনি তোমার প্রতি কুরআনকে বিধানস্বরূপ দিয়েছেন, অবশ্যই তিনি তোমাকে প্রত্যাবর্তনস্থলে (মক্কায়) ফিরিয়ে নেবেন।
— Al-Qasas 28:85

তাকে বিজয় দিবেন আল্লাহ বলেছেন।
তাকদীরের কথা আল্লাহ আগেই বলে দিয়েছেন। কিন্তু যখন আল্লাহ হিজরতের নির্দেশ দিলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি যে, যেহেতু আল্লাহ বিজয় দিবেন, তাই আমি হেঁটে হেঁটে চলে যাব। আল্লাহর উপর ভরসা করে হাঁটতে থাকব। অথবা, আমি কিছু না করে চুপ করে বসে থাকব। আর ভাগ্যে যা আছে হবে। না! তিনি সেই রাতের গভীরে ঘর থেকে বের হয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে শুয়ে রেখেছেন, যে পথে মানুষ মদিনায় যেতেন, তিনি সেই ঠিক উল্টো পথে গিয়ে সাওর গুহায় উঠেছিলেন। সেই গুহায় থেকে তিনি রাত কাটিয়েছিলেন। সেখানে এইভাবে একজন মানুষের জন্য যত কিছু দুনিয়ার কৌশল অবলম্বন করা যায়, প্রতিটি কৌশলই তিনি অবলম্বন করেছিলেন। তাহলে তাকদীরের বিশ্বাস কোথায়? আসুন দেখি তাকদীরের বিশ্বাস কোথায়?

যখন কাফেরেরা সেই পদ চিহ্ন ধরে খুঁজতে খুঁজতে সাওর গুহার পাশে পৌঁছে গেল, চারদিকে দেখতে লাগলো যে এত দূর আসার পর কোথায় গেল। সাওর গুহাটি এমন যে অনেকটা নিচু চালের মতো, মাটি থেকে উঠে উপরে যেয়ে বসা যায়, গুহার মুখ দিয়ে ঢুকলে ভেতরের দিকে উঠে বসতে হয়। যারা বাইরে থাকে, তারা মাটিতে মাথা না লাগালে ভেতরে কী আছে দেখতে পারবেন না। কিন্তু ভেতরে যারা আছেন তারা খুব সহজে বাইরের মানুষের পা দেখতে পান। যখন বাইরে মানুষরা হেঁটে বেড়াচ্ছে কাফেররা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, "ইয়া রাসুল আল্লাহ, কী উপায় হবে, এরা তো আমাদের ধরে ফেলবে।" তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বললেন:

إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا
যখন তারা উভয়ে পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান করছিল, সে তার সঙ্গীকে বলল, "তুমি চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।"

At-Taubah 9:40

এটা হল তাকদিরে বিশ্বাস।
আমি আল্লাহর পাঠানো কুরআনের গাইডেন্স অনুসারে চলতেছি, এখন ফয়সালা আল্লাহর হাতে।

قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ
বল, 'আমাদেরকে শুধু তা-ই আক্রান্ত করবে যা আল্লাহ আমাদের জন্য লিখে রেখেছেন। তিনিই আমাদের অভিভাবক, আর আল্লাহর উপরই যেন মুমিনরা তাওয়াক্কুল করে।'
— আল-কুরআন, At-Taubah 9:51

এই আয়াত পড়লে আপনার মনে হবে, ভালো-মন্দ সব আল্লাহর নির্ধারিত। অথচ আল্লাহ এখানে ব্যবহার করেছেন "كَتَبَ ٱللَّهُ" অর্থাৎ লিখে রেখেছেন। এখন প্রশ্ন হল কী লিখে রেখেছেন, কোথায় লিখে রেখেছেন? উত্তর হল কোন কাজের ব্যাপারে কোন তাকদীর তা কুরআনেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন। যেমন এই আয়াতের উত্তর পাবেন এর পরের আয়াতে:

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِۦٓ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ
বল, 'তোমরা কেবল আমাদের জন্য দুইটি কল্যাণের (হয় শাহাদাত না হয় বিজয়) একটির অপেক্ষা করছ, আর আমরাও তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি যে, আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাত দ্বারা আযাব দেবেন। অতএব তোমরা অপেক্ষা করো, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ।'
— At-Taubah 9:52

অর্থাৎ আল্লাহর নিয়ম অনুসারে কাজ করলে, আমার তাকদীর কী কী হতে পারে তাও আল্লাহ বলে রেখেছেন কুরআনে। এর বাইরে অন্য কিছু ঘটবে না।

অর্থাৎ তাকদীরে বিশ্বাস আপনাকে সকল দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করবে। আল্লাহর ফয়সালা যেটা হোক, ব্যাপার না, আমাকে আল্লাহ বলেছেন আমি কাজ করেছি।
আমি পড়ালেখা করেছি, চাকরি করেছি, ইন্টারভিউ দিয়েছি, আমি নদীতে ঝাঁপ দিয়েছি, আমি আল্লাহর নির্দেশ মতো সব করেছি, কিন্তু ফলাফল তো আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী হবে। কাজেই, এজন্য আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই।

এই বিষয়টি কুরআনের একটি আয়াতে বলা হয়েছে:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
"তোমাদের জন্য যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, যদিও তা তোমাদের অপছন্দনীয়। হতে পারে, তোমরা কোনো কিছু অপছন্দ কর, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং হতে পারে, তোমরা কোনো কিছু পছন্দ কর, অথচ তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। আর আল্লাহ জানেন, কিন্তু তোমরা জানো না।"
— সূরা আল-বাকারাহ (2:216)

তাকদীরে বিশ্বাস আমাদেরকে সকল দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করে। কর্মে উদ্দীপনা দেয়, সকল হতাশা থেকে মুক্ত করে। এটা হল তাকদিরে বিশ্বাস।
আর যদি কেউ এই তাকদিরে বিশ্বাসকে, ভাগ্যে যা আছে হবে, করবো না। এটা হল শয়তানের ওয়াসওয়াসা। কাফেররা এটা বলতো। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আসছে, এটা হল ইসলামী শরীয়তের সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা। আল্লাহ বলছেন, আমি যেভাবে গাইডলাইন পাঠাইছি সে অনুসারে কাজ করে যাও, ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চিন্তা করো না, আল্লাহ ফয়সালা দিবেন। আর আমরা বলতেছি, আল্লাহ্র গাইড লাইন অনুসারে চলব না, কিন্তু আল্লাহর হিসাব নেব, আল্লাহ ভাগ্যে কি লিখে রাখছে দেখি। এটা সম্পূর্ণ অনৈসলামিক চিন্তা।

মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষ করতে, মানুষকে সকল বাঁধন মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ শক্তি অর্জন করার জন্য এটি তাকদীরে বিশ্বাস সবচেয়ে বড় অবলম্বন।
আল্লাহ বলেন:

فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَابَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
ফলে তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে কষ্টের ওপর কষ্ট দিয়েছিলেন; যাতে তোমরা দুঃখ না করো তোমাদের যা হাতছাড়া হয়েছে এবং যে বিপদ তোমাদের ওপর এসেছে তার জন্য। আর তোমরা যা করো আল্লাহ তার খবর রাখেন।
— Aal-e-Imran 3:153

মানুষ কোন বিপদে হতাশ হবে না, কোন প্রাপ্তিতে অহংকারী হবে না, কোন প্রাপ্তিতে সীমালংঘন করবে না, কোন দুর্ভাগ্যে হতাশ হয়ে আসবে না, বরং সে সবসময় কর্ম উদ্দীপনায় থাকবে, যদি সে সত্যিকারভাবে তাকদিরে বিশ্বাসী হয়।
তাকদিরে বিশ্বাস কর্মের আগে, কর্মের সাথে এবং কর্মের পরে। আল্লাহর নির্দেশ কর্মকে এগিয়ে নিবে, কর্মের সাথে সাথে অহংকার এবং দুশ্চিন্তা মুক্ত করবে তাকদীরে বিশ্বাস। কর্মের পরে হতাশা থেকে রক্ষা করবে আমাদেরকে তাকদির বিশ্বাস। কেননা, আল্লাহর নিয়মের মধ্যে কোন ভুল নাই, কিন্তু অন্য নিয়মের মধ্যে ভুল আছে।

আমরা যেটাকে ভাগ্য বলি—আমি ভালো খারাপ যাই করি, তা আল্লাহ আগে থেকেই লিখে রেখেছেন, এই ধরনের বিশ্বাসের কোনো প্রমাণ কুরআনে পাওয়া যায় না। অনেক বাঙালির তাকদীরে বিশ্বাস আর মক্কার কাফিরদের ভাগ্যে বিশ্বাস এক রকম—

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
আর যারা শিরক করেছে, তারা বলল, ‘যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে আমরা তাঁকে ছাড়া কোনো কিছুর ইবাদাত করতাম না এবং আমাদের পিতৃপুরুষরাও করত না। আর আমরা তাঁর বিপরীতে কোনো কিছু হারাম করতাম না। এমনিই করেছে, যারা তাদের পূর্বে ছিল। সুতরাং স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া ছাড়া রাসূলদের কি কোনো কর্তব্য আছে?’
— আন-নাহল 16:35

سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآ آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ
অচিরেই মুশরিকরা বলবে, ‘যদি আল্লাহ চাইতেন, আমরা শিরক করতাম না এবং আমাদের পিতৃপুরুষরাও শিরক করত না এবং আমরা কোনো কিছু হারাম করতাম না’। এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, যে পর্যন্ত না তারা আমার আযাব আস্বাদন করেছে। বল, ‘তোমাদের কাছে কি কোনো জ্ঞান আছে, যা তোমরা আমাদের জন্য প্রকাশ করবে? তোমরা

তো শুধু ধারণার অনুসরণ করছ এবং তোমরা তো কেবল অনুমান করছ।'
— আল-আনআম 6:148

আর, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে যে কাজ করে, তার জন্য তার বিচার হবে।
মানুষকে আল্লাহ যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন, এটা তাকদীর/ আল্লাহর নিয়ম যা আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে দেননি। কিন্তু এই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সে ভালো কাজ করবে, নাকি মন্দ কাজ করবে, সেটা তার ব্যাপার। ভালো কাজ কিভাবে করবে, আর মন্দ করলে কী শাস্তি দিবে, তা কিতাবে (কুরআনে) লেখা আছে।

এখন আপনারাই বলুন, আল্লাহ, যার জ্ঞান অনাদি অনন্ত, যিনি গায়েবের খবর জানেন, তিনি এই নিয়মগুলো/কদরগুলো যদি আজকে ঠিক করেন, অথবা কয়েক বিলিয়ন কোটি বছর আগে লিখেন, এতে কোনো সমস্যা কি?

কিন্তু যদি আপনি বলেন, আমি খারাপ কাজ করছি, এটা আল্লাহ কোটি বছর আগে লিখে রেখেছে বলেই করছি, না হয় করতাম না, এটার কোনো প্রমাণ আপনি কুরআন থেকে দিতে পারবেন না। এই বিশ্বাস মূলত তৎকালীন মুশরিকদের ধর্ম বিশ্বাস।

আল্লাহ কেন মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন?

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

(স্মরণ করো) যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বলেছিলেন, "আমি পৃথিবীতে (আমার) এক প্রতিনিধি (মানুষ) বানাব;" তারা বলেছিল, "তুমি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করতে চাও যে সেখানে গোলযোগ ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো তোমার সপ্রশংস গুণগান করছি এবং তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।" (জবাবে) তিনি বলেছিলেন, "আমি এমন তথ্য জানি যা তোমরা জান না।" Al-Baqarah 2:30

আল্লাহ যা জানে ফেরেস্থাদেরকে তা বুঝায় বললেন না কেন?

কুরআন পড়লে আপনি মানুষের ৩টি গুণ পাবেন, যা মানুষকে মর্যাদাপূর্ণ করেছে অন্য প্রাণী থেকে:
১. বুদ্ধিমত্তা
২. চয়েস—স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করে বলতে পারে এটা ঠিক, ঐটা ভুল।
৩. কষ্ট

এই ৩টির সমন্বয় আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন, এবং মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে আলাদা করেছেন—

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ
আর আমি তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি।
— আল-ইসরা 17:70

ফেরেশতাদের নিজস্ব চয়েস নেই, এক ফেরেশতা আরেক ফেরেশতাকে চড় মারে না, তাই আল্লাহ যে ক্ষমাশীল, এই ক্ষমা করা যে কতটা মহান কাজ হতে পারে, এটা ফেরেশতারা কি ততটা উপলব্ধি করতে পারবে, যতটা মানুষ পারবে? এই কারণে, মানুষ আল্লাহর গুণাবলী যতটা বুঝতে পারে, অন্য কোনো প্রাণী তা পারবে না। অন্য প্রানীদেরকে বুঝায় বললেও সে অনুধাবন করতে পারবে না।

আল্লাহ বলেন-

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ۚ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

আর যদি তোমার রব চাইতেন, তবে যমীনের সকলেই ঈমান আনত। তবে কি তুমি মানুষকে বাধ্য করবে, যাতে তারা মুমিন হয় ?Yunus 10:99

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ চাচ্ছেন না কেন-সবাই ইমান আনুক? এইখানে আল্লাহ বুঝাচ্ছেন-ফেরেস্তাদের কোন চয়েস নাই, আমি চাইলে, মানুশদেরকেও ফেরেস্তাদের মত বানাইতে পারতাম যে-সকলে আমার প্রতি ইমান আনবে। কিন্তু, আমি মানুষকে তার ইচ্ছার স্বাধীনতার উপর ছেড়ে দিছি। এই জন্য আল্লাহ তার জন্য জান্নাত রেখেছে। তাই, মানুষকে মুমিন হওয়ার জন্য বাধ্য করা আল্লাহ্‌র নিয়মের মধ্যে পড়ে না।

একটি প্রশ্ন হল, অনেক বাঙালি মুসলিমের তাকদীরের বিশ্বাস এবং মুশরিকদের ভাগ্যে বিশ্বাস এক রকম হয়ে গেল কেন?

১. বাংলাদেশসহ উপমহাদেশে মূলত মুশরিকদের অধিকারে ছিল। ইসলাম যখন বাংলায় প্রবেশ করে, তখন তাকদীর শব্দের সমতুল্য কোনো শব্দ বাংলা ভাষায় ছিল না। আবার, যেখানে সারাপৃথিবীতে অনুবাদের কাজ হয়, শব্দের সংজ্ঞা আকারে হয়, যাতে শব্দের ভাবটা বোঝা যায়; কিন্তু উপমহাদেশে ডিকশনারিগুলোতে আমরা দেখি—একটি আরবি বা ইংরেজি শব্দের অর্থ বাংলা আরেকটা শব্দ দিয়ে রিপ্লেস করে দেওয়া হয়। যার ফলে, আমরা বেশিরভাগ সময়ই শব্দের মূল ভাবটা থেকে দূরে সরে যাই। তাই, তাকদীরের অর্থ হিসেবে আমরা ভাগ্য ব্যবহার করেছি। এই শব্দ দিয়ে যে ভাবটা প্রকাশ পায়, তা আবার কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক।

২. কিছু কিছু মানুষ কুরআন এবং হাদিসের ভুল অনুবাদ করার কারনে।

৩. কুরআনের যেকোনো আয়াতের সরল অর্থ না নিয়ে নিজের মনমতো ব্যাখ্যা টানা। অথচ কুরআনের প্রতি আয়াতের রেফারেন্স একাধিক আয়াত থাকে। যখন আপনার করা অনুবাদ অন্য কোনো আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক হবে, তখন বুঝতে হবে আপনার অনুবাদ ভুল আছে।

৪. রেফারেন্স ছাড়া কুরআন ও হাদিসের নাম ব্যবহার করে মিথ্যা গল্পের ছড়াছড়ি। বিস্তারিত পাবেন- হাদিসের নামে জালিয়াতি, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহিমাহুল্লাহ)।

৫. কুরআনের অন্য আয়াতের সাথে সম্পর্কিত না করে ভুল ব্যাখ্যা।

"কদরিয়া" একটি গোষ্ঠী, যারা তাকদীর (আল্লাহর পূর্ব নির্ধারিত নিয়ম) অস্বীকার করে।
যেমন: একটি ছেলে একটি মেয়েকে বিয়ে করবে, এটা কদর বা নিয়ম। এখন যদি একটি ছেলে আরেকটি ছেলেকে বিয়ে

করে, তাহলে সে আল্লাহর দেওয়া কদরের/ নিয়মকে অস্বীকার করেছে, সে কদরিয়া গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলো। (আবার, কিছু জনগণ আবেগী হয় এই চিন্তা করে যে—তুমি আল্লাহ আমাদের যেমন খুশি তেমন চলাও, পুতুলের কী দোষ। আবার কিছু আল্লাহর সৃষ্টির এই সুশৃঙ্খল নিয়মকে মানে না, বিশেষ করে নাস্তিকরা। তারা উভয়ে কদরিয়া।)

দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ, পৃথিবীর প্রথম অভিধান প্রণেতা ও আরবী মাখরাজের জনক আল-খলিল (রহিমাহুল্লাহ) (১০০-১৭০ হিজরি) তার বিখ্যাত অভিধান "কিতাব আল-আইন"-এ কদর শব্দের ব্যাখ্যায় আরও বলেন:

أي بقَدّرٍ وقدر (مثقل ومجزوم) ، وهما .والمِقدارُ: اسم القدر إذا بلغ العبد المِقدارَ مات. والأشياء مقادير أي لكل شيء مقدار وأجل لغتان. والقَدْرُ: مبلغ الشيء. وقول الله عز وجل-: وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ،

أي ما وصفوه حق صفته. وقدِرَ على الشيء قُدْرةً أي ملك فهو قادِرٌ. واقتدَرْتُ الشيء: جعلته قَدْراً. والمُقتَدِر: الوسط، ورجل مُقتَدِرٍ الطول. وقول الله عز وجل- عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ

أي قادر. وقَدَرَ الله الرِّزق قدراً يَقدِرُه أي يجعله بقَدْرٍ. وسرج قَدْرٌ ونحوه أي وسط، وقَدَرٌ (يخفف ويثقل) . وتصغير القِدْرِ قُدَيْر بلا هاء، ويؤنثه العرب. والقَديرُ: ما طبخ من اللحم بتوابل، فإن لم يكن بتوابل فهو طبيخ. ومرق مقدور أي مطبوخ. والقُدارُ: الطباخ الذي يلي جزر الجزور وطبخها. وقَدَرْتُ الشيء أي هيأته.

"মিকদার" (নির্ধারিত নিয়মের শেষ সীমা) হলো কদর থেকে আসা আরেক নাম। যখন একজন বান্দা নির্দিষ্ট মিকদারে পৌঁছায়, তখন সে মারা যায়। প্রত্যেক জিনিসের নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। বৃষ্টি নির্দিষ্ট নিয়মে পড়ে। "কদর" শব্দের দুটি আঞ্চলিক রূপ রয়েছে: ১. "কদর" অর্থ হলো কোনো কিছুর পরিমাণ। আল্লাহর বাণী, "তারা আল্লাহকে যথাযথভাবে কদর করতে পারেনি," অর্থ হলো তারা আল্লাহকে সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারেনি। ২. "কদির" অর্থ হলো কোনো কিছুর উপর ক্ষমতা থাকা। "মুকতাদির" অর্থ সক্ষমতা। আল্লাহর বাণী "মালিক মুকতাদিরের নিকট" অর্থ হলো সর্বশক্তিমান। আল্লাহ যখন রিজিক কদরে নির্ধারণ করেন, তখন তা নির্দিষ্ট মাত্রায় আসে। "সারজ কদর" অর্থ হলো মাঝারি। "কদর" শব্দের ক্ষুদ্ররূপ হলো "কুদাইর"। "কাদির" অর্থ হলো মসলাযুক্ত মাংস যা রান্না করা হয়েছে, আর যদি মসলা না থাকে তবে তা সাধারণ রান্না। "মেরক মাকদুর"

আকীদা

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ও অভিধান প্রণেতা হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (মৃত্যু ৩৯৫ হিজরী) তার বিখ্যাত গ্রন্থ "মাকায়িস আল-লুগাহ"তে লিখেনঃ আকীদা এর মূল শব্দ(عَقَدَ) এর অর্থ হল "শক্তিশালী করা" এবং "দৃঢ়তা"। এই একটি ধারনা থেকে আকিদা শব্দের নানা ব্যবহার এবং অর্থ তৈরি হয়েছে যা বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রয়োগ করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ:

عَقْدُ الْبِنَاءِ (বাঁধনের গঠন) এবং এর বহুবচন أَعْقَادٌ ও عُقُودٌ। এটি কোন নির্দিষ্ট কাজ বা চুক্তি গঠনের নির্দেশ করে।

- عَقَدْتُ الْحَبْلَ (গিঁট বাঁধা) বা عَقَدَ النِّكَاحَ (বিবাহের চুক্তি গঠন) এর মাধ্যমে বন্ধনের শক্তি বোঝায়।

আল্লাহর কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" (চুক্তিগুলি পূর্ণ করো), যা আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূরণ কর।

Al-Ma'idah 5:1

عُقْدَةُ النِّكَاحِ এবং عُقْدَةُ الْبَيْعِ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ এগুলি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক চুক্তির প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হয়।

অন্যদিকে, الْمَعَاقِدُ (চুক্তির স্থান) শব্দটি একটি আরো সমৃদ্ধ দৃষ্টিকোণ নিয়ে আসে, যেখানে বিভিন্ন বিধি এবং শর্তাবলী বিশ্লেষণ করা হয়।

এইভাবে, عَقَدَ শব্দটি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এটি আমাদের সম্পর্ক এবং চুক্তির গভীরতা বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।“

এই রুটের সাথে সম্পর্কযুক্ত কুরআনে আয়াত আছে ৭ টি। সূরা আল-বাকারা (২:২৩৫),সূরা আল-বাকারা (২:২৩৭),সূরা আন-নিসা (৪:৩৩),সূরা আল-মায়িদা (৫:১),সূরা আল-মায়িদা (৫:৮৯),সূরা আল-মায়িদা (৫:৮৯),সূরা ত্বা-হা (২০:২৭),সূরা আল-ফালাক (১১৩:৪)

কিন্তু ধর্ম বিশ্বাস অর্থে এই শব্দের ব্যবহার কুরানে একবারও নাই। এবংকি ধর্ম বিশ্বাস অর্থে হাদিসেও আসে নাই।

শুধু তাই নয়, সরাসরি আকিদা শব্দটি কুরআন এবং হাদিস কোথাও ব্যবহার হয় নি।কিন্তু, তার রুট শব্দ থেকে তৈরি অন্য শব্দ আছে।

ধর্ম বিশ্বাস বুঝাতে আকিদা শব্দের ব্যবহার ৪র্থ হিজরি থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগগুলোতে ব্যাপক হলেও প্রাচীন আরবি ভাষায় এর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় না। বিশ্বাস বা ধর্ম বিশ্বাস অর্থে আকিদা ও ইতেকাদ শব্দের ব্যবহার কোরআন ও হাদিসেও দেখা যায় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর যুগে বা তার পূর্বের যুগে আরবি ভাষা বিশ্বাস অর্থে বা অন্য কোন অর্থে আকিদা শব্দের ব্যবহার ছিল বলে জানা যায় না। তবে দৃঢ় হওয়া বা জমাট হওয়া অর্থে ইতেকাদ শব্দটি ব্যবহার রয়েছে। [ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহিমাহুল্লাহ), কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা ৩১]

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন-ধর্ম বিশ্বাস বিষয়ক প্রসিদ্ধতম পরিভাষা আকীদা। হিজরী চতুর্থ শতকের আগে এই শব্দটির প্রয়োগ তত প্রসিদ্ধ নয়। চতুর্থ হিজরী শতক থেকে এ পরিভাষাটি প্রচলন লাভ করে।পরবর্তী যুগে এটি একমাত্র পরিভাষায় পরিণত হয়।

মুসলিম মাদরাসা বা স্কুল গুলোতে সর্বপ্রথম ধর্মতত্ত্ব (theology) অর্থে এই শব্দের ব্যবহার শুরু হয়।

ধর্মতত্ব নিয়ে তারা যে ডিপার্টমেন্ট খুলে তার নাম দেয় ইসলামি আকিদা (Islami Theology or Islamic Study) যা এখনো চলমান আছে।

এই রকম আরো বিভিন্ন নাম আছে-

যেমনঃ

খ্রিস্টান আকিদা (kristian Theology or kristian study)

হিন্দু আকিদা (Hindu Theology or Hindu study)

নাস্তিক আকিদা (Atheist Theology or Atheist study)

ইত্যাদি

পরিবারের দুই জন মানুষে চিন্তা ভাবনা যেমন হুবহু এক থাকে না, তেমনি ভাবে যে যখন যেভাবে যে স্কুলে আকিদা/থিউলোজি পড়ায়, দুই জনের পড়ানোর স্টাইল এক থাকে না।

তাই, ইসলামের মৌলিক বিষয়ে সব ইসলামিক মাজহাব/ স্কুলগুলো এক থাকলেও, কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য লক্ষনীয়, কেননা এক এক জনের বুঝার স্টাইল, পড়ানোর স্টাইল এক এক রকম।

চার মাজহাবের ইসলামি আকিদায় বা ইসলামিক স্টাডিতে মৌলিক বিষয়ে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। যে বিষয়গুলোতে মতপার্থক্য সেগুলো ঐচ্ছিক। কিন্তু মতপার্থক্য আছে।

বর্তমানে এসে আকিদার যে অর্থ সবাই করে, সে অনুসারে ইমান ও আকিদার ভিতর পার্থক্য কি?

ইসলামের পরিভাষায়, ইমান হল- কালেমায় বিশ্বাস স্থাপন যে , আপনি আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য মানবেন না। তাই, আল্লাহ যেখানে যেভাবে বিশ্বাস স্হাপন করতে বলেছে, সব জায়গায় বিশ্বাস স্হাপন করতে হবে।

আর, আকিদা শব্দটি কুরআন হাদিসের কোন শব্দ না। আমরা জানি, ভাষা একটা চলমান প্রক্রিয়া, যেটা সময়ের সাথে পরিবর্তন হয়। এই জন্য কুরআন বুঝার জন্য আমাদের উচিত, রাসূলের সমসাময়িক যে ডিকশনারী আছে সেখানে ফিরে যাওয়া, আর তা পড়ে অনুধাবন করা যে, তখন কার মানুষরা কুরআনের এক একটা শব্দ থেকে কোন ধারনা পাইতো।

যাই হোক, সামগ্রিক ধর্মীয় বিশ্বাসের সকল বিষয় আকিদায় অন্তর্ভুক্ত। তাই, বলা যায় ইমানের বিশ্বাস থেকে আরো ব্যপকতা বুঝাতে এই শব্দটা ব্যবহার হয়। যেমন: তারাবির নামাজ ২০ রাকাত না ৮ রাকাত নাকি আরো কম বেশী। আপনি কোনটা বিশ্বাস করবেন। এই রকম ঐচ্ছিক বিষয় গুলোও আকিদায় অন্তর্ভুক্ত। আকিদায় খুঁটি, নাটি সব বিষয় যেমন ইজমা, কেয়াস, আকল সহ সব কিছুই এই আকিদায় স্টাডি করা হয়।

ড. সালিহ আল ফাওজান তার আকিদাহ আত তাওহীদ বইতে লেখেন-আকিদা শব্দটি আরবি (আল আকদু) শব্দ থেকে গৃহীত এর অর্থ কোন কিছু বেঁধে রাখা। আমি এর উপর হৃদয় ও মনকে বেঁধেছি।মানুষ যে আদর্শ বিশ্বাস ও চিন্তাভাবনা অনুগত, আক্ষরিক অর্থে তাই হলো তার আকিদাহ।আরবিতে বলা হয় তার আকিদা উত্তম ;এর দ্বারা বুঝানো হয় যে- সে দৃঢ় ও অবিচল বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে সন্দিয়ান ও সংশয়বাদী নয়।আকিদা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ নয় বরং তা মূলত অন্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট। আকিদা হল কোন বিষয়ের প্রতি অন্তরে বিশ্বাস ও প্রত্যয় এবং আন্তরিকভাবে সে বিষয়কে সত্য প্রতিপন্ন করা।

কেন মুসলিমরা আজ ভাবাদর্শিকভাবে ডিবাইডেড

মানুষ ইসলামকে উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি হিসাবে বিবেচনা করে। কুরআনের মূল ভাবটা থেকে মানুষ দূরে চলে গেছে। আমি আপনি কুরআনের মৌলিক শব্দগুলো যে অর্থে বুঝি, তা ক্লাসিকাল বা প্রথম চারশত বছর যে ডিকশনারি গুলি পাওয়া যায় তার সাথে মিলিয়ে দেখবেন, আমারা কুরআন ভুল ভাবে বুঝতেছি। এই কারনে দেশে দেশে ইসলামী মুভমেন্ট গুলো সফল হচ্ছে না। আমরা যারা আজকে মুসলিম, তাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ নিজ ভাষায় বুঝায় বলতে বইলেন, দেখেন কয়জনে পারে। আবার, মানুষ কালেমার যে অনুবাদ করে, তা আগেরকার ডিকশনারী গুলোর সাথে মিলিয়ে দেখবেন, মিলতেছে কিনা। আপনি ৯৯% ভুল উত্তর পাবেন। যে কালেমা বুঝে ঘোষনা দেওয়ার মাধ্যমে ইমান আনতে হয়, সেটার যদি এই অবস্থা হয়, পুরো কোরআনের কি অবস্থা।

আবার, কুরআনের আলোকে যে ব্যক্তি স্পষ্ট কাফের বা মুশরিক, কিন্তু উত্তরাধিকারী সূত্রে সে মুসলিম, আমরা তাকে মুসলিম বলতেছি। তাই, আজকে আমাদেরকে শুনতে হয় দুনিয়াতে অনেক রকমের ইসলাম আছে কেও নাম দিছে মডারেট ইসলাম, কেও দিছে মৌলাবাদ, কারও ইসলাম মাজার কেন্দ্রিক, কারো পীর কেন্দ্রিক আরও কত কি। এক একটা সমাজ যেন একেক ধরনের ইসলাম।

অথচ, ইসলাম তো একটাই। এই বিভাজনের কারন শুধুমাত্র কালেমা। যেটাকে আমরা কেও গুরুত্ব দিচ্ছি না, অথচ কুরআন এই কালেমা প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রত্যেক জাতীর কাছে রাসুল পাঠিয়ে ছিলেন আর প্রত্যেকের দাওয়াত শুধুমাত্র এই একটাই ছিল।অথচ, আজ আমরা কালেমার অর্থ বুঝি না। তাই, আমাদের ইলাহ ও শত শত, ধর্মও শত শত। আজকে আল্লাহ্‌র স্থলে কাকে কাকে রব বানাচ্ছি আমরা রব শব্দের অর্থ না বুঝাতে বুঝতেছিনা। তাগুত কে চিনি না, শয়তানকে চিনি না, মুশরিক এর সঠীক ডেফিনেশন না জানায় আমরা মুশরিকদের চিনতেছি না। আমরা ইবাদত করি, কিন্তু ইবাদত বলতে কি বুঝায়,তা আমরা বুঝি না।

দুনিয়ার সব বুঝতে চাই, কিন্তু কুরআন বুঝতে চাই না, কালেমার মানে বুঝতে চাই না। অথচ, কত কঠিন কঠিন বিষয় আমরা বুঝি।

যাই হোক, একটা ভাবাদর্শিক আন্দোলন দরকার, যেখানে আমরা কালেমার যে ভাব/ সেন্স সেটাকে সকল মতের মানুষের কাছে পৌছে দিয়ে, কালেমার ভাবের ভিত্তিতে তাদেরকে ইউনাইটেড করতে পারবো।

সংক্ষেপে সকল শব্দের সংজ্ঞায়ন

আল্লাহ্‌র উলুহিয়াত প্রতিষ্ঠার জন্য, এবং উলুহিয়াত (শুধুমাত্র এক আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে হবে) বুঝানোর জন্য, কুরআন সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করেছে, অথচ আমরা এক আল্লাহ্‌র আনুগত্য বুঝি না। ইসলামের সকল জায়গায় এক আল্লাহ্‌র আনুগত্য কিভাবে উপস্থিত থাকে তা ডেফিনেশন গুলো গুরুত্ব দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন-

- ইবাদত: খুশি মনে আনুগত্য মেনে যে কাজ হয় সেই কাজকেই ইবাদত বলে। ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহ্‌র আনুগত্য মেনে যে কাজ হয়, সেটাকে আল্লাহ্‌র ইবাদত বলে।
- ইলাহ: খুশিমনে আনুগত্য মেনে যার জন্য কাজ করা হয় তাকে ইলাহ বলে। আর, যারা শুধুমাত্র এক আল্লাহ্‌র আনুগত্য খুশিমনে মেনে কাজ করে, তাদের ইলাহ শুধুমাত্র আল্লাহ।
- রব: যে আনুগত্য করার জন্য আদেশ দেয়, বিধান দেয়, হুকুম দেয় তাকে রব বলে। রব শব্দটা দাতা অর্থে ব্যবহার হয়। যে আশ্রয় দেয়,লালন পালন করে তাকেও রব বলে । আর বিশ্বজগতের রব হলেন একমাত্র আল্লাহ।
- তাগুত: তগা অর্থ - অবাধ্যতার শেষ সীমাও অতিক্রম করা। যে ব্যক্তি এই সীমা অতিক্রম করে, তাকে তাগুত বলা হয়।
- ইমান: খুশী মানে কোন কিছু মেনে নিয়ে সে অনুসারে কাজ করবেন, মনের এই দৃঢ় বিশ্বাসকে ঈমান বলে। আর ইসলামী পরিভাষাশা শুধুমাত্র খুশী মানে এক আল্লাহর আনুগত্য মেনে কাজ করতে হবে এই দৃঢ় বিশ্বাসকে ঈমান বলে। এজন্য আপনার ঈমান আপনাকে প্রতি কাজে কুরআনের কাছে যাইতে বাধ্য করবে যে, আপনি যে কাজটি করতে চাচ্ছেন সেটি কুরআনে অনুমোদন আছে কিনা।
- মুমিন: যে ইমান আনে তাকে মুমিন বলে। আর ইসলামী পরিভাষায়, যারা আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য করা যাবে না এই বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী তাদেরকে মুমিন বলে। অর্থাৎ যারা কালেমায় বিশ্বাসী তারাই মুমিন।
- শরিয়াহ: শরিয়াহ শব্দের অর্থ খাবার পানির উৎস। তাই, মানুষের আনুগত্যের সোর্সকেও শরিয়াহ বলে। আর ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহর পাঠানো বিধান যেখানে থাকে সেটাকে শরিয়াহ বলে। সেজন্য, মুসলিমদের শরিয়াহ হল কুরআন।
- দ্বীন: আনুগত্যের বিষয় সমূহকে একসাথে দ্বীন বলে। ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহ্‌র দেয়া আনুগত্যের বিষয় সমূহকে একসাথে আল্লাহ্‌র দ্বীন বলে।
- ইসলাম: ইসলামের শাব্দিক অর্থ হলো কারো ইচ্ছার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করা বা আত্মসমর্পণ করা। ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহর দেয়া সকল আনুগত্যের বিষয় সমূহ কাজে রূপ দিতে হবে অর্থাৎ সকল আনুগত্যের বিষয় সময় বিনাশত্বে মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে,এই আইডিয়া বা কনসেপ্ট বা ধারণাকে ইসলাম বলে।
- মুসলিম: যারা নিজেকে অন্যের ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে তাদেরকে মুসলিম বলে। আর ইসলামি পরিভাষায়, যারা আল্লাহর আনুগত্যের বিষয় সমূহ অনুযায়ী প্রাক্টিক্যালি কাজ করে তাদেরকে মুসলিম বলে।

- শিরক: শারাকা (شَرَكَ) এর মূল ধারণা হল—শেয়ারিং এবং পার্টনারশিপ (অংশীদারিত্ব)। শিরক শব্দটি বোঝায় এমন অধিকার বা কোন কিছু যা দুই বা তার অধিক জনের মধ্যে ভাগ করা হয় এবং কোন একজন একা সেই অধিকার বা বস্তু পায় না। আর ইসলামি পরিভাষায়, শিরক শব্দের অর্থ অংশীদার করা।, সমস্ত আনুগত্য আল্লাহর অধিকারে। এখন আপনি যদি আল্লাহর আনুগত্যের স্থলে অন্য কারো আনুগত্য করেন, তাহলে আল্লাহর অধিকারে আপনি অন্য কাওকে অংশ দিলেন। কেননা আরেকজনের আনুগত্য করার অধিকার তো আপনাকে দেয়া হয়নি। আল্লাহর আনুগত্যে অন্য কাওকে অংশীদার করাকে ইসলামী পরিভাষায় শিরক বলে।
- মুশরিক: যে অংশীদার বা শিরক করে তাকে মুশরিক বলা হয়। ইসলামি পরিভাষায়, যারা আল্লাহর আনুগত্যের স্থলে অন্যের আনুগত্য করে তাদেরকে মুশফিক বলে।

- কুফরঃ "(কাফ, ফা ও রা) তিন অক্ষরের ক্রিয়ামূলটি একটি বিশুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করে, তা হল: 'আবৃত করা বা গোপন করা'। কোন ব্যক্তি যদি তার পরিহিত বর্মকে তার কাপড় দিয়ে আবৃত করেন, তবে বলা হয় তিনি তার বর্ম 'কুফর' করেছেন। চাষীকে 'কাফির' (আবৃতকারী) বলা হয় কারণ তিনি শষ্যদানাকে মাটি দ্বারা আবৃত করেন।" ইসলামি পরিভষায় কেও যদি আল্লাহ্‌র বিধানকে অপছন্দ দিয়ে আবৃত করে, তবে সে কুফর করল’
- কাফের: যে কুফর করে তাকে কাফের বলে। আর ইসলামি পরিভাষায়, যে আল্লাহর আনুগত্যসমূহ এর যে কোন এক বা একাদিককে অপছন্দ দিয়ে ঢেকে দেয়, তাকে কাফের বলে। কাফের বিশ্বাসগত মুশফিক কর্মগত।
- নিফাকঃ, এটি দিয়ে এমন পথ বুঝায় যেখান থেকে গোপনে বাহির হওয়া যায়। ইসলামি পরিভাষায়, যারা মুখে ইমানের দাবি করলেও অন্তরে কুপুরি লুকিয়ে রাখে অর্থাৎ ইমান থেকে গোপনে বাহির হয়ে থাকে।
- মুনাফিক: মুনাফিক হল এমন ব্যক্তি যে বাইরের চেহারায় আল্লাহর আনুগত্য পছন্দ করে দেখায় কিন্তু ভিতরে আল্লাহর আনুগত্যসমূহকে অপছন্দ করে ।

- ফাসিকঃ যে বা যারা আগে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করত। এরপর যারা এক বা একাদিক বিষয়ে আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে বের হয় তাদেরকে ফাসিক বলে।
- মোত্তাকিঃ যারা সদা সর্বদা সতর্ক হয়ে চলাফেরা করে নিজেদেরকে বা অন্য কোন কিছুকে সুরক্ষা দিয়ে চলে তাকে মোত্তাকি বলে। ইসলামি পরিভাষায়, আর, যারা আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী জীবনযাপন করে তাদেরকে মোত্তাকি বলে।
- জাহিলিয়্যাহ: "جهل" (জাহিল) শব্দটি "علم" (জ্ঞান) এর বিপরীত। এটি অজ্ঞতা, অজ্ঞতার অবস্থা বা যেকোনো বিষয়ে জ্ঞানহীনতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।যেহেতু আল্লাহ সবচেয়ে বড় জ্ঞানী, তাই যে সমাজ শুধুমাত্র এক আল্লাহ্‌র আনুগত্যের উপর প্রতির্ষ্ঠিত থাকে না তাকে জাহিলিয়্যাহ সমাজ বলে।
- শয়তান: শিন (ش), ত্ব (ط) এবং নুন (ن) নিয়ে গঠিত শব্দের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও সঠিক মূল আছে, যার অর্থ হলো দূরত্ব বোঝানো। মানুষকে যে তার উদ্দেশ্য বা অবস্থান থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, তাকে শয়তান বলে। ইসলামি পরিভাষায়, যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে চায় তাকে যে বা যারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে দূরে নিয়ে যায়, তাদেরকে শয়তান বলে।
- আল্লাহ্‌র কিতাব : (كَتَبَ): এর মূল শব্দ তিনটি বর্ণের সংমিশ্রণ, যা কিছু জিনিস একত্রিত করার ধারণা প্রদান করে।, লিখিত তথ্য আকারে যেটা থাকে সেটাই কিতাব। কুরআনে আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে লিখিত দুই ধরনের কিতাবের কথা পাই।

  একটি হচ্ছে মূল কিতাব বা কিতাবের মা, যা আল্লাহর কাছেই সংরক্ষিত থাকে। যেখানে ইউনিভার্সালের সকল

নিয়ম, আমাদের চোখের আড়ালের যত তথ্য, আমি আপনি সহ যে যা-ই করুক সব লিপিবদ্ধ হয়। তাই, এই কিতাবের লেখা চলমান আছে।অন্য ধরনটা হল আসমানি কিতাব, যেটা মূলত মূল কিতাবের অংশ। মানুষের জন্য গাইডেন্স হিসেবে যতটুকু দরকার, ততটুকু তথ্য আল্লাহ মূল কিতাব থেকে মানুষের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাতাবা আল্লাহঃ মানুষের ও জীনের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিকে পরিচালনা করার জন্য আল্লাহ গাইডেন্স লিখে রেখেছেন সেটাই কাতাবা আল্লাহ।

- তাকদীর : "কদর (قدر): আল কদর অর্থ সফল নিয়ম/সঠিক সিদ্ধান্ত।" এ বিশ্বের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আল্লাহ প্রতিটি সৃষ্টির জন্য যে সুশৃঙ্খল নিয়ম, কার্যপ্রণালী বা ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাকেই তাকদীর বলা হয়। যেমন : সূর্য পূর্ব দিকে উঠে, এটা তাকদীর। কেও চাইলেও তাকে পশ্চিম দিক থেকে উঠাতে পারবেন না তাকদীরে বিশ্বাস মানুষকে বাস্তববাদী করে তুলে।

QURAN LEXICON INSTITUTE